রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীপুলিনবিহারী সেন
করকমলে

ভূমিকা

রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর বাহির হইল— রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহের অন্তর্গত কবির কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কবিতা ও কাব্যগুলির আলোচনা। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ বাহির হইয়াছে— সন্ধ্যাসংগীত হইতে বলাকা পর্যন্ত কাব্যের আলোচনা। সুযোগ-সুবিধা ঘটিলে বলাকা-উত্তর কাব্যের আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু সে কবে বলিতে পারি না। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহের আলোচনা লিখিতেছি। এই একখানি পুস্তক প্রকাশের উপলক্ষ্যে যে এত কথা বলিতে হইল তাহার কারণ সমস্ত পুস্তকেরই একটিমাত্র লক্ষ্য—রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ও মানসের উৎসমূলে পৌঁছিবার চেষ্টা। সমস্ত 'প্রবাহ'ই সেই দুর্গম দুর্জ্ঞেয় উৎস হইতে নির্গত, সেখানে পৌঁছিবার জন্য প্রবাহের উজান ঠেলিয়া চলা ছাড়া উপায় নাই; সহস্র যাত্রীর মধ্যে আমিও একজন।

যে নদীগুলি ভারতবর্ষকে শ্যামল শোভন ও সরস করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের সকলেরই উদ্ভব কৈলাসপর্বত ও মানস-সরোবরের হিমভূমি। রবীন্দ্রনাথের কাব্য, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং কর্মকীর্তিরও একটিমাত্র উদ্ভবভূমি অনুমান করা বোধ করি অন্যায় হইবে না। গঙ্গা এবং যমুনা যেখানে জলের নিশানা পরিত্যাগ করিয়া চিহ্নহীন তুষারে মূর্ছিত সেখান হইতে মানসের পথ চিনিয়া যাওয়া বড় সহজ নয়। ছায়াবিরল সেই পর্বতসংকটে আপনার ছায়াই পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া পথিককে ভ্রান্ত করে, পদচিহ্নহীন তুষারে নিজের পদচিহ্নই পথিককে অকারণে উল্লসিত করিয়া তোলে। নিজের মনের বিচার যেখানে মরীচিকাস্রোতকে প্রবলতর করে, নিজের সংস্কার সেখানে ধ্রুবতারা বলিয়া বোধ হয়, সেখানে পথ চলা সহজ নয়, চেনা রীতিমত কঠিন। এমন ক্ষেত্রে নৈরাশ্য অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু নৈরাশ্যের প্রতিকার তো পথিকেরই

হস্তগত। রবীন্দ্রকাব্যের শঙ্খ কর্ণে স্থাপন করিলেই সমুদ্রনির্ঘোষ শ্রুত হইতে থাকে। গিরিপ্রহরীর দুর্গমে মানস-সরসী সমুদ্রের বন্দী কন্যা ছাড়া আর কি? কবি-মানস সেই বিশ্বমানসেরই অংশ।

এবারে আমার সাহিত্যিক ঋণ স্বীকারের পালা। আমার সাহিত্যিক উত্তমর্ণের আর অন্ত নাই। তাহার আবার দুই শ্রেণী, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত—অজ্ঞাত উত্তমর্ণের সংখ্যাই বোধ করি অধিক। জ্ঞাতের সংখ্যাও কম নয়। বিশ্বভারতীর অন্তর্গত শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীকানাই সামন্ত রবীন্দ্র-কাব্যের স্বর্ণপুরীতে ভূগর্ভ হইতে নিত্য-নূতন জীবন-তথ্য আবিষ্কার করিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণকে অদৃশ্য কৃতজ্ঞতাপাশে বাঁধিবার আয়োজন করিতেছেন। তাহাদের তিন জনের কাছেই আমি সমধিক ঋণী। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে পুলিনবিহারীর ঋণ প্রায় অপরিশোধ্য। শ্রীকানাইলাল সরকারের উৎসাহ সতত উদ্যত না থাকিলে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হইত এমন ভরসা নাই, আদৌ লিখিত হইত কিনা তাহাই সন্দেহের বিষয়। যখন লিখিত ও প্রকাশিত হইল গোড়াতেই ইহার দোষগুণের অধিকারভেদ করিয়া দেওয়া উচিত। ইহার দোষের (অনেক আছে) সমস্ত দায়িত্ব একমাত্র আমারই, আর ইহার গুণের (কিছুই কি নাই!) সমস্ত দায়িত্ব আমার সাহিত্যিক উত্তমর্ণগণের, আর ইহার দোষগুণের মিশ্র ফলের অধিকারী উৎসাহী বাঙালী পাঠক।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর

15th February
1877

রবীন্দ্র-কাব্যের পারিপার্শ্বিক

আমাদের সৌভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে এমন এক সময়ে জন্মিয়াছিলেন যখন বাঙালী-সমাজের ভিত্তিতে ফাটল এমন প্রশস্ত হয় নাই যে, এক খণ্ড হইতে অন্য খণ্ডে চলাচল নিতান্ত দুস্তর। ফাটল তখনই ধরিয়াছিল, কিন্তু তাহার সূক্ষ্ম রেখা তখনও সমগ্রতার পক্ষে বাধাস্বরূপ হয় নাই, এমন কি, সে সূক্ষ্মতা অধিকাংশ লোকেরই চোখে পড়ে নাই। স্থূলভাবে বিচার করিয়া আমরা বলিতে পারি, ব্যাবহারিকভাবে তখন সমগ্র বাঙালী-সমাজ অখণ্ড অতএব এক ছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনের মূলে, সুতরাং তাহার কাব্যের মূলে এই অখণ্ড বাঙালী-জীবন। একদিন অকস্মাৎ স্বপ্ন ভাঙিয়া যে নির্ঝরিণী বিশ্বের অভিমুখে বাহির হইয়া পড়িল, তাহাকে যেন সমগ্র বাঙালী-জীবন বরফগলা জলের দ্বারা পুষ্ট করিয়াছে। অবশ্য পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-কাব্যের ভিত্তি প্রশস্ততর হইতে হইতে, ক্রমে অধিকতর ভূমি গ্রাস করিতে করিতে বিশ্বকে পাদপীঠ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নির্ঝরের সঙ্গে দেশবিদেশের ধারা মিশিতে মিশিতে তাহা বিশ্বের রসজাহ্নবী হইয়া পড়িয়াছে।

যে মূর্তিকার আমাকে বানিয়ে তুলেছেন তার হাতের প্রথম কাজ বাংলা দেশের মাটি দিয়ে তৈরি। একটা চেহারার প্রথম আদল দেখা দিল। সেটাকেই বলি ছেলেবেলা, সেটাতে মিশোল বেশি নেই।—ছেলেবেলা, ১৪

কোনো কবির কাজ বিচারের পক্ষে তাহার প্রাথমিক ভিত্তিটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রাথমিক ভিত্তি তাঁহার সামাজিক ভিত্তি, তাঁহার জাতির ভিত্তি, যে মাটিতে ভর করিয়া কবি প্রথমে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, সেই মাটির দৃঢ়তা ও উদারতার উপরে অনেকখানি নির্ভর করে। সৌভাগ্যবশতঃ রবীন্দ্রনাথ জাতির এমন এক সন্ধিক্ষণে জন্মিয়াছিলেন, যখন বাঙালী-সমাজ আজিকার মতো ফাটিয়া এমন চৌচির হইয়া গিয়া সংকীর্ণ হইয়া পড়ে নাই। আর মাটির দৃঢ়তা! বাংলাদেশের পলিমাটি অবশ্য নরম—কিন্তু তাহার তলে রহিয়াছে ভারতবর্ষের বজ্রবৎ কঠিন গ্রানিটস্তর। বাঙালীর জীবন অবশ্য চিরকালই ভাবালুতায় দোলায়মান, কিন্তু তাহার পিছনে রহিয়াছে ভারতবর্ষের বহুযুগপুঞ্জিত তপশ্চর্যার কঠোরতা।

রবীন্দ্রনাথ যদি আর পঞ্চাশ বছর পরে জন্মগ্রহণ করিতেন, কিংবা ত্রিশ বছর পরেও! প্রতিভার প্রাচুর্য সত্ত্বেও এমন মহত্ত্ব লাভ করিতেন কি না সন্দেহ। এই অত্যল্প কালের মধ্যে প্রাথমিক ভিত্তির উদারতা যে অনেক সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পরবর্তী কালে জন্মিলে তিনি মহৎ জাতীয় কবি মাত্র হইতে পারিতেন—কিন্তু মহত্তর সর্বজাতীয় কবি হইতেন কি না সংশয়।

শেক্সপীয়রও ইংলণ্ডের ঠিক এমনি এক সময়ে জন্মিয়াছিলেন—যখন সমাজ-ভিত্তিতে ফাটল ধরিয়াছে বটে, কিন্তু তখনও দুর্লঙ্ঘ্য বাধারূপে আত্মপ্রকাশ করে নাই। ফলে তিনি নিজের পাদপীঠরূপে সমগ্র ইংরেজ-সমাজের জীবনকে লাভ করিয়াছিলেন। আর কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া

মিল্টনের সমকালে জন্মিলে মিল্টনের মতোই তিনি আংশিক জীবনের মহাকবি হইতেন। মিল্টন পিউরিটান দৃষ্টির মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন, শেক্সপীয়র খুব সম্ভব ক্যাভেলিয়র দৃষ্টির মহাকাব্য লিখিতেন, কিংবা তাহার চেয়েও যে আশঙ্কা অধিকতর ছিল—প্রথম চার্লসের দলে যোগদান করার অপরাধে পিউরিটানদের হাতে কবির প্রাণদণ্ডের বিধান হইত, আর মিল্টন তাহা সাগ্রহে সোল্লাসে সমর্থন করিতেন।

সর্বজাতীয়তার ভিত্তি জাতীয় জীবন; নিখিল মানুষের আশ্রয় দেশের মানুষ; বনস্পতির চারাটিকেও প্রথমে একখানি বাঁশের কঞ্চি অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইতে হয়। এ-কথা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ভুলিয়া যাই—বিধাতাপুরুষ ও মানবপ্রকৃতি এই অতি প্রাথমিক সত্যটা একমুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হয় না। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ যে সেই যুগে জন্মিয়া মহাকবি হইবার পাদপীঠ লাভ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের সৌভাগ্য। প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে, যতদিন না আবার শতদীর্ণ বাঙালী-সমাজ জোড়া লাগিতেছে ততদিন বাঙালী-জাতির মধ্যে আর মহাকবি হইবার সম্ভাবনা নাই। শক্তিমান লেখকের শক্তির অনেকটাই এই ফাটলপথে রসাতলে চলিয়া যাইবে; যে-রসে সে পুষ্ট হইতে পারিত তাহা তাহার কোনো কাজে লাগিবে না।

এখনকার দিনে শিক্ষিতে অশিক্ষিতে, শহরে গ্রামে, কৃষি ও ইণ্ডাস্ট্রিতে সমাজ বহুখণ্ড হইয়া গিয়াছে; একের সঙ্গে অন্যের যে যোগ নাই, মাত্র তাহা নয়—একটি অন্যের পরিপন্থী। এখানে কেহ কেহ জাতিভেদের প্রশ্ন তুলিতে পারেন, বলিতে পারেন, সে ভেদ কি ভেদ নয়? জাতি-

ভেদের ভেদ দাবার ছকের নানা রঙের ভেদের মতো— সবটা মিলিয়া তবেই তাহার সমগ্র চেহারা ; ঐ ভেদটুকু আছে বলিয়াই পক্ষ প্রতিপক্ষ সাজিয়া খেলা চলে— সব একাকার হইলে কোনো কাজ চলে না। আসল কথা, বহুকাল হইল আমাদের সমাজ জাতিভেদটাকে তাহার ভালোমন্দসুদ্ধ স্বীকার করিয়া লইয়া কাজ চালাইবার মতো একটা ব্যাবহারিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিল ; আদর্শের বিচারে হয়তো খাটো ছিল— কিন্তু কোনোরকম করিয়া কাজ চলিয়া যাইত— একেবারে অচল অবস্থার উদ্ভব হয় নাই। এই অচল অবস্থার উদ্ভব হইল অন্যপ্রকার ভেদে— ভারতীয় জীবনের উপর য়ুরোপীয় জীবনের সংঘাতে। ভারতীয় মন্ত্রের উপরে যখন য়ুরোপীয় যন্ত্র আসিয়া পড়িল, এদেশীয় সমাজচৈতন্যের উপরে যখন য়ুরোপীয় ব্যক্তিচৈতন্য আসিয়া পড়িল, তখন দেখিতে দেখিতে এদেশের শিক্ষিতে অশিক্ষিতে, শহরে গ্রামে, ব্যবসায়ে বাণিজ্যে ফাটল চৌচির হইয়া দেখা দিল। য়ুরোপ যে অরাজকতার সমুদ্রে আজ চার-শ বছর আগে পাড়ি ধরিয়াছিল, কালের দৈর্ঘ্যের জন্য তাহার জীবনে যে পরিবর্তন মন্থরগতিতে আসিয়াছে, আমরা অত্যল্প সময়ে সেই অরাজকতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলাম। ফলে বিরাট একটা অরাজকতার সমুদ্রে আমরা হাবুডুবু খাইতেছি, ডুবিব কি উঠিব জানি না— ইহার মধ্যে আত্মস্থ হইয়া মহাকাব্য-রচনার, চরম শিল্পসৃষ্টির সুযোগ কোথায় ? রবীন্দ্রনাথ অন্ততঃ কৈশোরে ও যৌবনে এই সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হন নাই। তিনি কিছুক্ষণের জন্য তীরে দাঁড়াইয়া, সমাহিত হইবার, সমগ্রটাকে দেখিবার, মহাকাব্যের আত্মস্থতা লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন।

এখনকার বাঙালীর মতো সবটা মনোযোগ কেবল নিজের জন্যই তাঁহাকে ব্যয় করিতে হয় নাই-- আর তাহা করিতে হয় নাই বলিয়াই তিনি একসঙ্গে আত্মদর্শন ও বিশ্বদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমাজের এই দুই চেহারাই দেখিয়াছেন।

তখনকার কথা যতই ভাবি আমার একটি কথা কেবলি মনে হয়, তখনকার দিনে মজলিস বলিয়া একটা পদার্থ ছিল এখন সেটা নাই। পূর্বেকার দিনে যে একটি নিবিড় সামাজিকতা ছিল আমরা যেন বাল্যকালে তাহারই শেষ অস্তচ্ছটা দেখিয়াছি। পরস্পরের মেলামেশাটা তখন খুব ঘনিষ্ঠ ছিল সুতরাং মজলিস তখনকার কালের একটা অত্যাবশ্যক সামগ্রী। যাঁহারা মজলিসি মানুষ ছিলেন, তখন তাঁহাদের বিশেষ আদর ছিল। এখন লোকেরা কাজের জন্য আসে, দেখাসাক্ষাৎ করিতে আসে, কিন্তু মজলিস করিতে আসে না। লোকের সময় নাই এবং সে ঘনিষ্ঠতা নাই। তখন বাড়িতে কত আনাগোনা দেখিতাম— হাসি ও গল্পে বারান্দা এবং বৈঠকখানা মুখরিত হইয়া থাকিত। চারিদিকে সেই নানা লোককে জমাইয়া তোলা, হাসিগল্প জমাইয়া তোলা, এ একটা শক্তি— সেই শক্তিটাই কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে। মানুষ আছে, তবু সেইসব বারান্দা সেইসব বৈঠকখানা যেন জনশূন্য। তখনকার সময়ের সমস্ত আসবাব আয়োজন ক্রিয়াকর্ম সমস্তই দশজনের জন্য ছিল— এইজন্য তাহার মধ্যে যে জাকজমক ছিল তাহা উদ্ধত নহে। এখনকার বড়ো মানুষের গৃহসজ্জা আগেকার চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু তাহা নির্মম, তাহা নির্বিচারে উদারভাবে আহ্বান করিতে জানে না—খোলা গা, ময়লা চাদর এবং হাসিমুখ সেখানে বিনা হুকুমে প্রবেশ করিয়া আসন জুড়িয়া বসিতে পারে না। ..

আমাদের মুশকিল এই দেখিতেছি, নিজেদের সামাজিক পদ্ধতি ভাঙিয়াছে, সাহেবি সামাজিক পদ্ধতি গড়িয়া তুলিবার কোনো উপায় নাই— মাঝে হইতে প্রত্যেক ঘর নিরানন্দ হইয়া গিয়াছে। আজকাল কাজের জন্য দেশহিতের জন্য দশজনকে লইয়া আমরা সভা করিয়া থাকি— কিন্তু কিছুর জন্য নহে, শুদ্ধমাত্র দশজনের জন্যই দশজনকে লইয়া জমাইয়া বসা— মানুষকে ভালো লাগে বলিয়াই মানুষকে একত্র করিবার নানা উপলক্ষ্য সৃষ্টি করা— এ এখনকার দিনে একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। এত বড়ো সামাজিক কৃপণতার মতো কুশ্রী জিনিস কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। এইজন্য তখনকার দিনে যাহারা প্রাণখোলা হাসির ধ্বনিতে প্রত্যহ সংসারের ভার হালকা করিয়া রাখিয়াছিলেন— আজকের দিনে তাঁহাদিগকে আর-কোনো দেশের লোক বলিয়া মনে হইতেছে।—জীবনস্মৃতি, "বাড়ির আবহাওয়া"

সেইসব লোকের সামাজিক হাসি ক্রমবিস্তীর্ণ ফাটলের কীর্তিনাশা পার হইয়া ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর প্রতিধ্বনিতে আসিয়া পৌঁছিতেছে— আর কয়দিন পরে এই প্রতিধ্বনিও আর শুনিতে পাওয়া যাইবে না।

সামাজিক মনের বদলের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আচার-ব্যবহার, আসবাবপত্র, ঘরবাড়ির আকৃতি পর্যন্ত বদলাইয়া গিয়াছে। বৈঠকখানা হইয়াছে ড্রয়িংরুম, ফরাস হইয়াছে চৌকি-টেবিল। ফরাসে দশজনের জায়গায় ঠাসাঠাসি করিয়া পনেরোজন বসা যায়— কিন্তু চেয়ারের অনমনীয় সংকীর্ণতায় একের স্থানে দুইজনকে ধরে না। এক একখানি চেয়ার যেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এক-একটি কিণ্ডারগার্টেন স্কুল। আর বাড়িগুলির চেহারাতেই বা কত বদল হইয়াছে। চিৎপুর বাগবাজার অঞ্চলের বিরাট প্রাসাদোপম বাড়িগুলিতে কত

তালা, কত কক্ষ, বারান্দার সে কি অকারণ উদারতা, আঙিনায় কি জনতাগ্রাসী প্রশস্তি, আর বিশাল বলিষ্ঠ স্তম্ভগুলির কি স্ফীতি! এ-সব বাড়ি কি শুধু মালিকের জন্য তৈয়ারি হইয়াছিল! এ-সব বাড়িতে যে আস্ত একটা পাড়ার লোক ধরিতে পারিত! আত্মীয়-স্বজন আপন-পর দূর-নিকট রবাহূত-অনাহূত সকলেরই আশ্রয় ছিল এইসব বাড়িতে। এ যেন এক-একটা সামাজিক দুর্গ—কেবল বাসস্থানমাত্র নয়। ইহাদের সঙ্গে কত প্রভেদ কলিকাতার নূতন পত্তনের বাড়িগুলির! ছাঁটাকাটা, বাহুল্যহীন, পায়রা-খুপি। এত বেশি সংযত যে ভালোবাসিতে পারা যায় না; এত বেশি ভদ্র যে, অভদ্র বলিয়া সন্দেহ জন্মায়! এইসব বাড়ির ফিলজফি কি? "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী!" এখানে রবাহূত-অনাহূত তো দূরের কথা, আপন স্ত্রীপুত্রকন্যাটি ছাড়া আর কাহারো স্থান নাই। এ যেন এক-একটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিখা—কোনোমতে শুইয়া বসিয়া দুঃসময়ের রাত্রিটুকু অতিবাহিত করিয়া দিবার জন্য। এক বাড়ির দশটি ফ্ল্যাটে যে দশটি পরিবার থাকে তাহারা কেহ কাহাকেও চেনে না, জানে না; চিনিবার জানিবার প্রয়োজন পর্যন্ত অনুভব করে না। পাশের মানুষ সম্বন্ধে এতখানি যাহার নির্মম ঔদাসীন্য, তাহারই কিনা আপিস হইতে আসিয়া পোশাক ছাড়িবার সবুর সয় না, রেডিও-সেটে চাবি ঘুরাইয়া দিয়া বুয়েনোস্ এয়ারিসের নূতনতম সংবাদ সংগ্রহ করিতে বসিয়া যায়। তাহার সব চেষ্টাই যে বৃথা চেষ্টা, তাহার কারণ পায়ের তলায় তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই; সামাজিক ভিত্তি বলো, জাতির ভিত্তি বলো—কিছুই নাই।

আর তাহারই অবচেতন অভাব-মোচনের জন্য সে রেডিওর চাবি দিয়া একটার পরে একটা খুলিয়া যাইতে থাকে। শূন্যাশ্রয়ী ত্রিশঙ্কু ত্রিভুবনের পরিহাসের পাত্র, বড়জোর করুণার, তাহাকে দিয়া কোনো কাজ চলে না।

জীবনস্মৃতির যুগের সঙ্গে বর্তমানের প্রভেদটা বুঝাইবার জন্য আর-একটা অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

> রবিবারে রবিবারে জ্যোতিদাদা দলবল লইয়া শিকার করিতে বাহির হইতেন। রবাহূত অনাহূত যাহারা আমাদের দলে আসিয়া জুটিত তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা চিনিতাম না। তাহাদের মধ্যে ছুতার কামার প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই লোক ছিল।...
>
> মানিকতলায় পোড়ো বাগানের অভাব নাই। আমরা যে-কোনো একটা বাগানে ঢুকিয়া পড়িতাম। পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসিয়া উচ্চনীচ নির্বিচারে সকলে একত্র মিলিয়া লুচির উপরে পড়িয়া মুহূর্তের মধ্যে কেবল পাত্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম। – জীবনস্মৃতি, "স্বাদেশিকতা"

এমনটি কি আজকালকার দিনে হইতে পারে? ভোটের জন্য আমরা দরিদ্রের দ্বারস্থ হই বটে, সে আর-এক কথা। পরোপকারের জন্য দুর্গতের কাছে যাওয়া, তাহার মধ্যেও আত্মশ্রেষ্ঠতার চৈতন্য গুপ্ত থাকে। কিন্তু কেবল আমোদের জন্য, বিহারের জন্য এমন নির্বিচার সম্মিলন আধুনিক কালে কখনোই দেখা যায় না। গ্রামাঞ্চলে এখনো থাকিতে পারে, কিন্তু কলিকাতায় অসম্ভব। দ্বারকানাথের পৌত্রের চেয়ে ধন ও বংশমর্যাদায় যাঁহারা অনেক নিচে তাঁহারাও এমন নির্বিচার মিশ্রবিহারে নিশ্চয় রাজি হইবেন না। এই শিকারি দলটির কি অদ্ভুত বৈচিত্র্য! দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র, রাজনারায়ণ বসুর মতো সাধু ও পণ্ডিত, ব্রজবাবুর মতো

রাশভারি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া অজ্ঞাত-পরিচয় ছুতোর-কামার! এ যেন চসারের ক্যান্টার্বেরি তীর্থ-যাত্রীর দল। জীবনস্মৃতির যুগে আজিকার মতো সমাজচৈতন্যের সূত্র একেবারে ছিন্ন হইয়া যায় নাই। সেইজন্য দ্বারকানাথের পৌত্রকে ধরিয়া টান দিলে পাড়ার ছুতোর-কামার পর্যন্ত টান পড়িত। এখনো আমাদের হয়তো ছুতোর-কামারের সঙ্গে মিলিয়া দাঁড়াইবার ইচ্ছা আছে— কিন্তু যতই টান দাও, টান বেশিদূর পর্যন্ত পৌছায় না; অনেক টানাটানির ফলে কেবল একটি-একটি গুটি খসিয়া হাতে আসে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের শুষ্ক রুক্ষ রুদ্রাক্ষের গুটি; সমগ্র সমাজ-মাল্যের আর দেখা পাই না— সূত্র যে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

তখনকার দিনে শহরে গ্রামে প্রভেদ প্রকট হয় নাই, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধনের এক আসরেই স্থান ছিল। এই অতিপ্রাথমিক সত্য দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'র পাতায় পাতায় ইহার প্রচুর উল্লেখ আছে।

জীবনস্মৃতি বাংলাসাহিত্যে বোধকরি সবচেয়ে সুখপাঠ্য গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের মধ্যবয়সে লিখিত এই বইখানি রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যমণির মতো দুলিতেছে। ইহার পূর্বের ও পরের রবীন্দ্রনাথের স্টাইল সম্বন্ধে লোকের মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু জীবনস্মৃতির স্টাইল সম্বন্ধে শত্রু-মিত্র সকলে একমত। এই বইখানিতে কবি সকলের মন হরণ করিয়া লইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের ‘জীবনস্মৃতি’র সঙ্গে গ্যয়টের জীবনচরিত ‘কল্পনা ও সত্যে’র অনেক মিল আছে। গ্যয়টেও তাঁহার জীবন-চরিতের দ্বারা জার্মান পাঠকের মন কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার ‘ফাউস্ট’ ও লিরিক কবিতাগুলি ছাড়িয়া দিলে জার্মান সাহিত্যে এমন সর্বজন-আদৃত পুস্তক আর নাই।

গ্যয়টে এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেরই জীবনকথা জীবনের সিংহদ্বারের কাছে আসিয়া অকালে থামিয়া গিয়াছে। জীবনের উদ্যোগপর্বটার বিশ্লেষণ করিয়া, যে-সব মালমশলা যে-সব প্রভাব-উপাদানে তাঁহাদের জীবন গঠিত তাঁহারা দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু যেখান হইতে তাঁহাদের কবিজীবন বৃহত্তর সংসারে প্রবেশ করিল সেখানে আসিয়া তাঁহারা নীরব। জীবনের উত্তরপর্বগুলি তাঁহারা লেখেন নাই কেন? তাহার কারণ, সে কাহিনী তাঁহাদের কাব্যে নাটকে গানে গল্পে লিখিত হইয়া চলিয়াছে। তাঁহাদের রচিত সাহিত্যেই তাঁহাদের জীবন। বাস্তবিক গ্যয়টে ও রবীন্দ্রনাথের মতো এমন আত্মজীবনাশ্রয়ী সাহিত্যিক আর আছেন কিনা সন্দেহ।

সম্প্রতি ‘জীবনস্মৃতি’র সঙ্গে ‘ছেলেবেলা’ যুক্ত হইয়াছে। দুইই জীবনী বটে, তবে দুইখানি দুই জাতের রচনা। এ সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন —

> এই বইটির বিষয়বস্তুর কিছু কিছু অংশ পাওয়া যাবে জীবনস্মৃতিতে কিন্তু তার স্বাদ আলাদা — সরোবরের সঙ্গে ঝরনার তফাতের মতো। সে হল কাহিনী, এ হল কাকলি, সেটা দেখা দিচ্ছে ঝুড়িতে, এটা দেখা দিচ্ছে গাছে।—ছেলেবেলা, ভূমিকা

এই প্রভেদ অন্য রকমেও বোঝানো যাইতে পারে। ‘জীবন-স্মৃতি’ চিত্রশালা আর ‘ছেলেবেলা’ রূপকথার জগৎ। ‘জীবন-

স্মৃতি'তে কবি জীবনকে দূর হইতে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন—যেন ছবি দেখার মতো। চিত্রে আর চিত্রকরে দূরত্ব যতই থাক্, তবু যোগ না থাকিয়া উপায় নাই। 'জীবনস্মৃতি'র জীবন আলেখ্য ও কবির মধ্যে সেই রকমের প্রভেদ।

'ছেলেবেলা' রূপকথার জগৎ; সে যেন আর কাহারো সৃষ্টি, তাহার উপরে কবির কোনো কর্তৃত্ব যেন নাই। আর দশ জনের মতো তিনিও একজন দর্শকমাত্র। এমন হইবার কারণ, কবির বাল্যকাল ও এই গ্রন্থরচনার মধ্যে সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধান। শুধু তাই নয়, কবির ছেলেবেলার সেই যুগ, সেই আবহাওয়া, সেই সব নরনারী কবে বাস্তবলোক হইতে অপসারিত হইয়া কবির মনোলোকে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। বাস্তব রূপ ছাড়িয়া আজ তাহারা যে-রূপ গ্রহণ করিয়াছে, সে রূপকথার রূপ।

দূরত্বের যথেষ্ট অভাবের জন্য জীবনস্মৃতির চিত্রশালায় কবি যে পরিপ্রেক্ষিতটি লাভ করেন নাই, ছেলেবেলাতে সেই রূপকথার পরিপ্রেক্ষিতটি লাভ করিয়াছেন। আর এই রূপকথার জগৎ হইতে নিজেকে তিনি সম্পূর্ণ বিবিক্ত মনে করিয়াছেন বলিয়াই পূর্বতন গ্রন্থে সংকোচবশত যে-সব কথা বলিতে পারেন নাই, এবারে তাহা বলিয়াছেন। জীবনস্মৃতিতে যাহা ছিল নিজের কথা, বড়জোর শিল্পীর কথা— এবারে তাহা হইয়াছে সম্পূর্ণ ভিন্ন আর-এক ব্যক্তির কথা। ভূমিকায় কবি বলিয়াছেন, "ভাবলুম ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের কথা লেখা যাক।" এ যে কেবল ছেলেমানুষ তাহা নয়, অন্য জগতের মানুষ; সে-জগৎ, পূর্বেই বলিয়াছি, রূপকথার জগৎ। আরো একটি লক্ষ্য করিবার মতো বিষয়-- ছেলেবেলার

স্টাইল লিখিত-সাহিত্যের স্টাইল নয়, তাহা রূপকথার স্টাইল— অর্থাৎ তাহাতে কলমের স্পন্দ তেমন ধরা পড়ে না, যেমন ধরা পড়ে রূপকথা বলিবার দীর্ঘবিতানিত লতানমনীয় কণ্ঠস্বর।

৩

রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্যে যে-সব প্রভাব পড়িয়াছে, জীবনস্মৃতি গ্রন্থে সেইসব সূত্রের মূল বর্ণিত আছে। কবি যেন অন্তত একবারের জন্য নিজ জীবনের ইন্দ্রধনু বিশ্লেষণ করিয়া উপাদানগুলি পাঠককে দেখাইয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থের সুখপাঠ্যতা ছাড়িয়া দিলেও এই জন্যও ইহা রবীন্দ্রানুরাগীর পক্ষে নিতান্ত অপরিহার্য গ্রন্থ।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্যে সবচেয়ে বড় প্রভাব বিশ্ব-প্রকৃতির। প্রকৃতি তাঁহার কাছে সবচেয়ে জীবন্ত, সবচেয়ে সত্য সত্তা। ইহা এমন অবিসংবাদিত সত্য যে, প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই— আশা করি এ বিষয়ে পাঠক আমার সঙ্গে অভিন্নমত। সিদ্ধান্ত লইয়া যখন তর্কের অবসর নাই, তখন দেখাইলেই চলিবে যে, কোন্ অভিজ্ঞতার সোপান-পরম্পরা আরোহণ করিয়া কবি বিশ্বপ্রকৃতির অন্দরমহলে পৌঁছিয়াছেন।

শ্যাম নামে এক ভৃত্য-বালক রবীন্দ্রনাথকে সংকীর্ণ এক গণ্ডি টানিয়া তন্মধ্যে বসাইয়া রাখিত। বালক-কবি সেই গণ্ডিকে অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিতে না পারিয়া সেই সংকীর্ণ স্থানে বসিয়া বৃহত্তর বাহিরটাকে অনুমানের দ্বারা অতিরঞ্জিত করিয়া সৃষ্টি করিয়া উপভোগ করিতেন। এই শ্যামের গণ্ডির স্মৃতিই যেন সারাজীবন ধরিয়া তিনি মস্তিষ্কে বহন

করিয়া চলিয়াছেন। স্বল্প অভিজ্ঞতার বাহিরের যে জীবন, কি মানুষের, কি প্রকৃতির, রবীন্দ্রনাথ তাহা কল্পনায় সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন; তাহার কতক বাস্তবের সঙ্গে মেলে, কতক আবার মেলে না। যে-অংশে মেলে, পাঠক বেশ বুঝিতে পারে, যে-অংশে মেলে না, পাঠক বুঝিতে না পারিয়া বলে— রবীন্দ্রনাথে বস্তুতন্ত্র নাই।

শ্যামের গণ্ডির ফলে মানুষের সংসারকে যেমন, তেমনি প্রকৃতিকে তিনি আড়াল-আবডাল হইতে দেখিয়াছেন। কলিকাতা শহরের প্রকাণ্ড বাড়ির মধ্যে একটি অসহায় বালকের পক্ষে প্রকৃতির নিরাবরণ মূর্তি দেখিবার সুযোগ কোথায়? কিন্তু পুরাপুরি দেখিতে পান নাই বলিয়া কোনো ক্ষতি হইয়াছে মনে হয় না। অর্ধেক না-দেখার আগ্রহ তাঁহার চিত্তকে সতত সজাগ করিয়া রাখিয়াছে। গুণ্ঠনসুন্দর মুখচ্ছবিকে রহস্যময় করিয়া সুন্দরতর করিয়া তোলে। পাড়াগাঁয়ে জন্মিলেই যে প্রকৃতির আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথে অধিকতর হইত এমন মনে করিবার কারণ নাই, বরঞ্চ তাঁহার কবিপ্রকৃতি অনুধাবন করিয়া আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, বালককালে পল্লীগ্রামের অবাধ প্রকৃতির মধ্যে সঞ্চরণ করিবার সুযোগ পাইলে প্রকৃতির আকর্ষণ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রভাব হইয়া দাঁড়াইত না; হয়তো মানুষ প্রধানতম প্রভাব হইয়া উঠিয়া প্রকৃতি গৌণ হইয়া পড়িত। পল্লী প্রকৃতিপ্রধান, শহর মানবপ্রধান, কিন্তু কোন্‌টি যে কাহার উপর কি রকম প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহা পূর্বাহ্ণে বলা যায় না; অনেকটা নির্ভর করে মনের গড়নের উপর, এক-একজন এক-একরকম প্রবণতা লইয়া জন্ম-গ্রহণ করে— রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা স্বভাবতই প্রকৃতিকে গ্রহণ

করিবার পক্ষে সহজ ছিল। শহরের অর্ধাবগুণ্ঠিত প্রকৃতি সেই প্রবণতার সাহায্য লইয়াছে মাত্র।

প্রকৃতির অন্দরমহলে পৌঁছিবার যে তিনটি ধাপের চিহ্ন জীবনস্মৃতিতে দেখা যায় সেগুলি এই— জোড়াসাঁকোর বাড়িতে প্রকৃতির দূরাপহৃত অর্ধগুণ্ঠিত মূর্তি দর্শন ; গঙ্গাতীরে পেনেটির বাগানে প্রকৃতির কোলের কাছে উপবেশন ; ও হিমালয়ে গিয়া প্রকৃতির মধ্যে আত্মবিসর্জন।

জোড়াসাঁকোর বাড়ির প্রাকৃতিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন—

বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্তপ্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ-শব্দ-গন্ধ দ্বার-জানলার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গবাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত আমি ছিলাম বদ্ধ— মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই।— জীবনস্মৃতি, "ঘর ও বাহির"

পেনেটির বাগানবাড়ির অভিজ্ঞতা— যখন প্রকৃতির সহিত কবির পরিচয় আর একটু ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে—

এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্ পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল।...প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি-পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে

যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে।...কড়ি-বরগা-দেয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম। সকল জিনিসকেই আর-একবার নূতন করিয়া জানিতে গিয়া পৃথিবীর উপর হইতে অভ্যাসের তুচ্ছতার আবরণ একেবারে ঘুচিয়া গেল।... আমরা বাহিরে আসিয়াছি, কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই। ছিলাম খাঁচায়, এখন বসিয়াছি দাঁড়ে—পায়ের শিকল কাটিল না।—জীবনস্মৃতি, "বাহিরে যাত্রা"

হিমালয়ে গিয়া কবির স্বাধীনতা ও সেই সঙ্গে তাঁহার জগৎ অনেকটা বাড়িয়া গেল। দুপুরবেলা পড়িতে বসিলেই তাঁহার ঘুম পাইত— আর ছুটি পাইলেই

ঘুম কোথায় ছুটিয়া যাইত। তাহার পরে দেবতাত্মা নগাধিরাজের পালা।... আমাদের বাসার নিম্নবর্তী এক অধিত্যকায় বিস্তীর্ণ কেলুবন ছিল। সেই বনে আমি একলা আমার লৌহফলকবিশিষ্ট লাঠি লইয়া প্রায় বেড়াইতে যাইতাম। বনস্পতিগুলা প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো মস্ত মস্ত ছায়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের কত শত বৎসরের বিপুল প্রাণ।... বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই যেন তাহার একটা বিশেষ স্পর্শ পাইতাম।—জীবনস্মৃতি, "হিমালয় যাত্রা"

এবারকার হিমালয়-যাত্রার প্রভাব তাঁহার কবিকাহিনী ও বনফুল কাব্যে রহিয়াছে। তাহার গুরুত্ব এতই বেশি যে, ঐ সময়ে কবির হিমালয়-দর্শন না ঘটিলে ও-দুইখানি কাব্য নিশ্চয় ঐ আকার পাইত না।

পরবর্তী কালে অর্থাৎ শিলাইদহ-পর্বে কবির কৈশোরের প্রকৃতির আকর্ষণের সঙ্গে প্রকৃতির পরিচয় যুক্ত হইয়াছে এবং আরো পরবর্তী কালে অর্থাৎ শান্তিনিকেতন-পর্বে এ দুইয়ের সঙ্গে নূতন একপ্রকার আধ্যাত্মিকতা সংযুক্ত হইয়া, কবির অভিজ্ঞতা ক্রমে পূর্ণতার মুখে চলিয়াছে।

৪

রবীন্দ্রনাথের উপরে মহর্ষির প্রভাব অল্প নয়। তবে ইহাকে প্রভাব বলিতে দ্বিধা হয় এই জন্য যে, ইহা প্রভাব না হইয়া পিতা হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইতেও পারে।

মহর্ষির মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন কবি ছিল— তাহার প্রধান পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার প্রকৃতিপ্রীতিতে। মহর্ষির পুত্রগণের মধ্যে, যতদূর জানি, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রই পিতার এই গুণ সবচেয়ে বেশি পাইয়াছিলেন।

মহর্ষি গম্ভীর প্রকৃতির লোক হইলেও প্রচুর হাস্যরসবোধ তাঁহার ছিল। তাহার সব পুত্রেরাই পিতার এই গুণ পাইয়াছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথে এই গুণ সর্বাধিক বর্তিয়াছে।

তার পর, মহর্ষি সাধক হইলেও বিষয়কর্মকে কখনো অবহেলা করেন নাই, তিনি নিপুণ বিষয়ী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চরিত্রেও এই স্বাভাবিক বিষয়দক্ষতা দেখা গিয়াছে। কবি হইলেই যে সংসারবিমুখ অবিষয়ী হইতে হইবে, রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবন তাহার সুদীর্ঘ প্রতিবাদ।

কিন্তু এগুলিকে প্রভাব বলা যায় না। এবারে যাহা বলিব, খুব সম্ভবত তাহা প্রভাবের অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে মহর্ষি বছরের অধিকাংশ সময়ই বিদেশে কাটাইতেন — মাঝে মাঝে কখনো কদাচিৎ বাড়ি আসিতেন। পিতার এই অনুপস্থিতি বালকের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল— বহু পরবর্তী কালে রচিত 'শিশু' কাব্যে তাহার পরিচয় আছে। 'শিশু' কাব্যের প্রধান চরিত্র শিশু-পুত্র ও তাহার মাতা। পিতা বিদেশে রহিয়াছেন, মাঝে মাঝে তাহার চিঠিপত্র আসে, এই

পর্যন্ত। 'শিশু' কাব্যের শিশু কবির মাতৃহীন পুত্র; এই মাতৃহীন পুত্রের অভিজ্ঞতার সঙ্গে, হয়তো নিজের অগোচরেই, নিজের পিতৃহীন (অনুপস্থিত অর্থে) শৈশবের স্মৃতি মিশিয়া গিয়া এই কাব্যের রসসৃষ্টিতে সাহায্য করিয়াছে।

এখানে রবীন্দ্রনাথের উপরে তাঁহার জননীর প্রভাবের কথা বলা যাইতে পারে। বাল্যকালে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। সেই মাতৃবিয়োগের দুঃখ নূতন করিয়া এবং সত্য করিয়া—কারণ অল্পবয়সের দুঃখ অনেক সময় অল্পবয়সে মানুষ তেমন করিয়া বুঝিতে পারে না—কবি যেন পাইলেন নিজের পুত্রের মাতৃবিয়োগে। এই একখানি কাব্যে একই সঙ্গে পুত্রের ও নিজের মাতৃবিয়োগদুঃখ মিশ্রিত। ইহাকে যাঁহারা অসম্ভব মনে করেন, তাঁহারা মানুষের মনের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ নহেন। কোন্ সূত্রের সঙ্গে যে কোন্ সূত্র মিশিয়া যাইতেছে, কখন কোন্ সমুদ্রের জোয়ার যে ইহার মোহানায় ঢুকিয়া পড়ে, তাহা কে নিশ্চয় করিয়া বলিবে। যে দুঃখ অবচেতন অবস্থায় ত্রিশ বছর কবির মনে ছিল, পুত্রের মাতৃশোকের উপলক্ষ্যে তাহা অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করিয়া দুইপুরুষের অশ্রুর গঙ্গা-যমুনার যুক্তবেণীর তীরে অমর কাব্য রচনা করিয়া তুলিল।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁহার উপরে সবচেয়ে বেশি। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, নিজের লেখাপড়ার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া বাস করিতেন; সত্যেন্দ্রনাথও বয়সে যথেষ্ট বড়, তা ছাড়া চাকুরি উপলক্ষ্যে দূরে দূরে থাকিতেন। হেমেন্দ্রনাথ বড় রাশভারি লোক ছিলেন, বিশেষ তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের

শিক্ষা প্রভৃতির অব্যবহিত কর্তৃপক্ষ। কাজেই ইহাদের কাহারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অবকাশ কবির ছিল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার চেয়ে বয়সে যথেষ্ট বড় হইলেও, তিনি অনুজকে বন্ধুরূপে কাছে টানিয়া লইলেন। হেমেন্দ্রনাথ ইংরেজি শিক্ষাকে গৌণ স্থান দিয়া রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাকে বাংলা ভাষার পথে চালিত করিয়া তাঁহার মহদুপকার করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অনেক বেশি। তিনি সংগীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে নিজের সঙ্গে টানিয়া লইয়া অবাধ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন।

জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে সমস্ত ভালো-মন্দর মধ্য দিয়া আমাকে আমার আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে। জীবনস্মৃতি, "গীতচর্চা"

আগেই বলেছি সেকালে বড়ো-ছোটোর মধ্যে চলাচলের সাঁকোটা ছিল না। কিন্তু এই সকল পুরোনো কায়দার ভিড়ের মধ্যে জ্যোতিদাদা এসেছিলেন নির্জলা নতুন মন নিয়ে। আমি ছিলুম তাঁর চেয়ে বারো বছরের ছোট। বয়সের এতদূর থেকে আমি যে তাঁর চোখে পড়তুম এই আশ্চর্য। আরো আশ্চর্য এই যে, তাঁর সঙ্গে আলাপে জ্যাঠামি বলে কখনো আমার মুখ চাপা দেন নি। তাই কোনো কথা ভাবতে আমার সাহসে অকুলোন হয়নি। ...এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা। জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গিতে ঝমাঝম সুর তৈরি করে যেতেন, আমাকে রাখতেন পাশে। তখনি তখনি সেই ছুটে-চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার।— ছেলেবেলা, ১০

জ্যোতিরিন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যে সংগীতে শিকারে অভিনয়ে সঙ্গী করিয়া লইয়া একদিনে তাঁহার বয়স বারো বছর বাড়াইয়া নিজের সহচর করিয়া লইলেন।

কবির কাব্য ও জীবনের উপর তাঁহার নতুন-বৌঠাকরুনের কিছু প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। এই মাতৃহীন বালককে স্নেহের সাহচর্য দ্বারা তিনি আপন করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার মৃত্যুতেই রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম মৃত্যুশোক পাইয়াছিলেন— "আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল সে স্থায়ী পরিচয়।"

কিন্তু ইনি ছাড়া আরো একটি মহিলা কিশোর-কবির জীবনে কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। বিলাতযাত্রার পূর্বে ইংরেজি শিখিবার উদ্দেশ্যে "কিছুদিনের জন্যে বোম্বাইয়ের কোনো গৃহস্থঘরে আমি বাসা নিয়েছিলুম।" এই বাড়ির একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে, মেয়েটিও রবীন্দ্রনাথকে কবি বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। তার পরে

কবির কাছ থেকে একটা ডাকনাম চাইলেন, দিলেম জুগিয়ে, সেটা ভালো লাগল তাঁর কানে। ইচ্ছে করেছিলেম সেই নামটি আমার কবিতার ছন্দে জড়িয়ে দিতে। বেঁধে দিলুম সেটাকে কাব্যের গাঁথুনিতে, শুনলেন সেটা ভোরবেলাকার ভৈরবী সুরে, বললেন, কবি, তোমার গান শুনলে আমি বোধ হয় আমার মরণ-দিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।— ছেলেবেলা, ১৩

কবি যখন নামটি স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করেন নাই, তখন আমাদের পক্ষে তাহা প্রকাশ করা ধৃষ্টতা হইবে, কিন্তু এই নামটি তাঁহার কাব্যে একবার মাত্র নয়, বারংবার ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসিয়াছে, কাব্যে, নাটকে উপন্যাসে। নামের গুরুত্ব কি এতই? বোধ করি বাস্তব-রূপের চেয়ে নাম-রূপই অধিকতর সত্য।

সে যাই হোক, এই মেয়েটি যে কবিকে প্রভাবিত করিয়াছিলেন, তাঁহার "দিনরাত্রির দাম" বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, 'ছেলেবেলা'তেই তাহার উল্লেখ আছে।

আমাদের ঐ বটগাছটাতে কোনো কোনো বছরে হঠাৎ বিদেশী পাখি এসে বাসা বাঁধে। তাদের ডানাব নাচ চিনে নিতে নিতেই দেখি তাবা চলে গেছে। তারা অজানা সুব নিয়ে আসে দূরেব বন থেকে। তেমনি জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন-মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলেব সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাজেব পাড় বসিয়ে দেয়, বরাবরেব মতো দিনরাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে।—ছেলেবেলা, ১৩

এ তো গেল মানুষের প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কোনো কোনো বাড়ির প্রভাবও রহিয়া গিয়াছে। এককালে যে বাড়িতে ছিলেন, সেই বাড়ির ছবি সেদিনকাব সুখদুঃখের বিচিত্র স্মৃতি বহন করিয়া তাঁহার কাব্যের মধ্যে গানের ধ্রুবপদের মতো ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান, মোরান সাহেবের বাগানবাড়ি। ইহা ছাড়া শাহিবাগের জজের বাড়ি, পেনেটির বাগানবাড়ি, শিলাইদহের কুঠিবাড়ির স্মৃতি তাঁহার কাব্যে বহুত্র রহিয়াছে। মোরান সাহেবের বাগানবাড়ির কথা 'জীবনস্মৃতি'র "গঙ্গাতীর" পর্যায়ে এবং 'ছেলেবেলা'র ১৩ অধ্যায়ে বিস্তারিত বিবৃত আছে। জীবনস্মৃতিতে কবি লিখিতেছেন—

ঘরগুলি সমতল নহে, কোনো ঘর উচ্চ তলে, কোনো ঘরে দুই চারি ধাপ সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া যাইতে হয়। সবগুলি ঘর যে সমরেখায় তাহাও নহে।—জীবনস্মৃতি, "গঙ্গাতীর"

এই বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, উত্তরায়ণের প্রথম বাড়িটি যেন মোরান সাহেবের বাড়ির ছাঁচেই গঠিত। পরবর্তীকালে কবি অনেক সময়ে বোটে করিয়া বেড়াইবার সময়ে মোরান সাহেবের বাগানবাড়ি যে-অঞ্চলে ছিল, সেখানে গিয়া নৌকা ভিড়াইয়া থাকিতেন। সে-বাড়ি কবে ডাণ্ডির কারখানা গ্রাস করিয়াছে, মুগ্ধ চিত্ত তবু তাহারই আশেপাশে ঘুরিয়া সান্ত্বনা পাইবার আশা পোষণ করিত।

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, বিহারীলালের মত কবিতা লিখিবেন। বিহারীলালকে একদা তিনি অনুকরণ করিতেন; কিন্তু অতি অল্প বয়সেই বিহারীলালের প্রভাব কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যাসংগীত হইতে তাঁহার কাব্য প্রকাশ্য মনে করেন; তৎপূর্বের কাব্য এতদিন অপ্রচলিত ছিল। সন্ধ্যাসংগীতের পূর্বেই তিনি বিহারীলালের প্রভাব উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রভাব দেখিতে হইলে 'বনফুল' 'কবি-কাহিনী' ও 'শৈশবসংগীত' পড়িতে হইবে। 'শৈশবসংগীত' হইতে একটিমাত্র উদাহরণ উদ্ধৃত করিব।

তরল জলদে বিমল চাঁদিমা
সুধার ঝরনা দিতেছে ঢালি।
মলয় ঢলিয়া কুসুমের কোলে
নীরবে লইছে সুরভি ডালি।

ইহার অনুরূপ বিহারীলালের বিশিষ্ট ছন্দ—

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে
অপরূপ এক কুমারীরতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম।... এইটেই আমার অভ্যাস হইয়া গিযাছিল। সন্ধ্যাসংগীতে আমি ইচ্ছা করিয়া নহে কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিযাছিলাম— জীবনস্মৃতি, "সন্ধ্যাসংগীত"

রবীন্দ্র-কাব্যে বিহারীলালের প্রভাব সম্বন্ধে যে-পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, তাহার যথোচিত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। বিহারীলালের প্রভাব যে রবীন্দ্র-কাব্যকে যথার্থ পথের নিশানা দিয়াছে, এমন মনে করিবার কারণ নাই। বরঞ্চ, বিহারীলালের প্রভাব কাটাইয়া উঠিবার পরেই রবীন্দ্র-কাব্যে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটিয়াছে। তবে বিহারীলালের স্বপক্ষে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, যে-সময়ে মাইকেলের প্রভাবে বাংলা কাব্য প্রধানত বহির্মুখী ছিল, তখন বিহারীলাল রবীন্দ্র-কাব্যকে হয়তো কিয়ৎপরিমাণে অন্তর্মুখীনতার ইশারা দিয়াছিলেন। কিন্তু আমি এমন মনে করি না যে, বিহারীলালে কাব্যের ইঙ্গিত ব্যতিরেকে রবীন্দ্র-কাব্য অন্তর্মুখী হইতে পারিত না— অন্তর্মুখীনতাই তাহার স্বাভাবিক খাত। কিন্তু কি হইতে পারিত তাহার বৃথা আলোচনা

না করিয়া যাহা হইয়াছে তাহাকে অনিবার্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়াই ভালো।

হেমচন্দ্রের প্রভাবও রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো কবিতায় পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়— কিন্তু অত্যল্পকালের মধ্যে এইসব প্রভাব অন্তর্হিত হয়।

আজি পূর্বনিমা নিশি,
তারকা-কাননে বসি
অলস-নয়নে শশী
মৃদু হাসি হাসিছে।
পাগল পরানে ওর
লেগেছে ভাবের ঘোর,
যামিনীর পানে চেয়ে
কি যেন কি ভাবিছে।

—শৈশবসংগীত

শৈশবসংগীতের অধিকাংশ কবিতা রবীন্দ্রনাথের তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের রচনা। এই কাব্যের "হর-হৃদে কালিকা" কবিতায় হেমচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট।

কে তুই লো হর-হৃদি আলো করি দাঁড়ায়ে
ভিখারীর সর্বত্যাগী বুকখানি মাড়ায়ে ? ..
তখনো রবি কি তুই এই বুকে দাঁড়ায়ে,
ভাবনা বাসনা হীন এই বুক মাড়ায়ে ?

ক্রিয়াপদের মিল ব্যবহার হেমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। এই কবিতায় অধিকাংশ মিল ক্রিয়াপদিক।

হেমচন্দ্রের প্রভাবযুক্ত আরও কয়েকটি বাল্যরচনা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

ঐ দেখ ছুটিয়াছে আর এক দল,
লোকারণ্য পথ মাঝে সুখ্যাতি কিনিতে :
রণক্ষেত্রে মৃত্যুর বিকট মূর্তি মাঝে,
শমনের দ্বার সম কামানের মুখে।[১]

—"অভিলাষ"

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসনপরি,
গান ব্যাস ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্বত শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার-শীতল বায়।[২]

—"হিন্দুমেলায় উপহার"

এই জাতীয় প্রভাবযুক্ত অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু স্বদেশপ্রীতি। স্বদেশপ্রীতি বিশেষ করিয়া যে হেমচন্দ্রের কাব্যেরই বিষয়বস্তু এমন নয়— তখনকার কালের অধিকাংশ কবিরই ইহা অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল। কাজেই ভাবসাম্যের দ্বারা প্রভাব বিচারের চেয়ে ছন্দঃস্পন্দের সাম্যের দ্বারা বিচার করাই যুক্তি-যুক্ত। যে-সব কবিতা উদ্ধার করিলাম তাহাদের ছন্দঃস্পন্দ স্পষ্টত হেমচন্দ্রীয়। শৈশবসংগীতের পরেই রবীন্দ্র-কাব্যে হেমচন্দ্রের প্রভাব তিরোহিত হয়।

১ কবিতাটি মুদ্রণকালে কবির বয়স তেরো বৎসর সাত মাস, দ্রষ্টব্য, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়

২ কবির বয়স তেরো বৎসর নয় মাস ; দ্রষ্টব্য, তদেব

তৎকালীন কবিশ্রেষ্ঠ মাইকেল মধুসূদন, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাঁহার প্রভাব একপ্রকার নাই বলিলেই হয়।

ইহার কারণ কি? মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতি ও কবিধর্ম এমনই বিপরীত যে, রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালেও অবচেতনভাবে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হন নাই। কবিধর্মের কিছু সাম্য থাকিলে তবেই আকর্ষণ সম্ভব, আর আকর্ষণের ফলেই প্রভাব। রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের দ্বারা প্রভাবিত হইতে প্রস্তুত ছিলেন না বটে, কিন্তু অস্পষ্টভাবে তাঁহার কাব্যের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে আক্রমণ করিয়াই তিনি সমালোচক জীবন আরম্ভ করেন; পরিণত বয়সেও মাইকেল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের মনে এই দ্বন্দ্বের কারণ উভয়ের কবিধর্মের ঐকান্তিক বৈষম্য। মাইকেল 'সন্ধ্যাসংগীত' পড়িলে বিচলিত হইতেন— কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসায় বোধ করি সম্মতি দিতেন না।

অবশ্য মাইকেল প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছেন, কাজেই ইহাকে মাইকেলের প্রভাব বলিতে পারা যায়। কিন্তু মাইকেলী অমিত্রাক্ষরে আর রাবীন্দ্রিক অমিত্রাক্ষরে প্রভেদ আছে। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর এপি-

---

৩ বিশ্বভারতী পত্রিকার বৈশাখ, ১৩৫০ সংখ্যায় শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন রচিত "'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা' নামে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ইহাতে লেখক রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনায় হেমচন্দ্র মধুসূদনের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কবির বাল্যরচনার একটি-মাত্র অংশে মাইকেলের প্রভাব তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তদ্দ্বারা বর্তমান লেখকের উক্তি অপ্রমাণ না হইয়া বরঞ্চ অধিকতর প্রমাণিত হয়।

কোচিত, কোনো কোনো স্থলে নাটকোচিত ; আর রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর কখনো কখনো নাটকোচিত হইলেও অধিকাংশ স্থলে লিরিক-ধর্মাক্রান্ত ; সে চলিতে গিয়া নাচিয়া ওঠে, বলিতে গিয়া গাহিয়া ওঠে ; তাঁহার অমিত্রাক্ষরের অভিসারিকা পায়ের নূপুর খুলিতে ভুলিয়া যায় বলিয়াই অন্ধকারেও সে শ্রুতিগম্য হইয়া ওঠে।

এ পর্যন্ত রবীন্দ্র-কাব্যে যে-সব প্রভাবের কথা বলা হইল তাহা নিতান্ত বাহ্য, অর্থাৎ রবীন্দ্র-কাব্যের বহির্লোকে মাত্র তাহা প্রতিফলিত হইয়াছে এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই তিরোহিত হইয়াছে। এবারে যে তিন কবির কথা বলিতেছি, তাহাদের প্রভাব রবীন্দ্র-কাব্যের অন্তর্লোক পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে— বৈষ্ণব কবি, শেলি ও কালিদাস। পূর্ববর্তী কবিদের ন্যায় ইঁহাদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কৈশোরপর্বে মাত্র পর্যবসিত নয়— ভিন্ন আকারে, সূক্ষ্মতর ভাবে ইঁহাদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের সহচর হইয়া পরিণত বয়স পর্যন্ত চলিয়াছে।

বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব প্রথম স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয় রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' কাব্যে। এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতা কবির ষোল হইতে বিশ বছর বয়সের মধ্যে রচিত। বিহারীলালের মতো, বৈষ্ণব কবিরাও রবীন্দ্রনাথের মুখ বহির্জগৎ হইতে অন্তর্জগতের দিকে ফিরাইতে সাহায্য করিয়াছিলেন ; রবীন্দ্রনাথের উপরে ইহাই বৈষ্ণব কবিদের সবচেয়ে বড় প্রভাব।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী বিদ্যাপতির অনুকরণে রচিত। বৈষ্ণব কাব্যের পিছনে একাধারে শিল্প ও সাধনা রহিয়াছে। ভানুসিংহে তাঁহাদের শিল্পটাই শুধু আছে, সাধনা নাই।

ইহার সগোত্র বৈষ্ণব কবিদের কাব্যে পাওয়া যাইবে না—ইহার একমাত্র সগোত্র ও অগ্রজ মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা কাব্য। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনের কাব্যে শিল্প ও সাধনা একসঙ্গে মিলিত হইয়াছে, ভানুসিংহের পদাবলীতে তাহা খুঁজিতে যাওয়া বৃথা।

কালিদাসের কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে পড়িয়াছেন, কুমারসম্ভবের কিয়দংশ অনুবাদও করিয়াছেন। তবে কালিদাসের প্রভাব তাঁহার কাব্যে 'মানসী'র সময় হইতে কার্যকরী হইয়া উঠিয়াছে; এই সময় হইতেই কালিদাসের কাব্য ও দর্শন রবীন্দ্রনাথের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

বিদেশী কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উপরে শেলির প্রভাব গভীরতম। অনেকের ধারণা 'সন্ধ্যাসংগীত' হইতে শেলির প্রভাবের যুগ—বাস্তবিক তাহা নয়। 'কবি-কাহিনী' ও 'বনফুল'-এও শেলির প্রভাব অবিরল। শেলির সমাজ-অসহিষ্ণুতা, তাঁহার শ্রেণীবর্ণশাসনহীন সমাজ-পরিকল্পনা, তাঁহার মানব-হীন বিশুদ্ধ প্রকৃতির প্রতি ঐকান্তিক আকর্ষণ, আর প্রকৃতির হাতেই যে মানবজীবনের সর্বদুঃখের সর্বৌষধি আছে এই ধারণা—এ সমস্তই পূর্বোক্ত দুই কাব্যে আছে। শেলির ভাব ও অলংকারের আতিশয্যজাত অসংযম, ছবির পরে ছবি আঁকিয়া রেখান্যাস অস্পষ্ট করিয়া ফেলা, রঙের পরে রঙ ঢালিয়া সব ঝাপসা করিয়া দেওয়া—শেলির এই সব শিল্প-রীতির অনেকগুলিই 'কবি-কাহিনী' হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুত বৈষ্ণব কবিদের চেয়েও কালিদাস ও শেলির প্রভাব তাঁহার কাব্যে ও সাহিত্যে অধিকতর গভীর ও দীর্ঘতর-

স্থায়ী। ইহার সঙ্গে আছে উপনিষদের তত্ত্ব। এই তিনটিই রবীন্দ্রনাথের জীবনের স্থায়ী ও সজীব প্রভাব, ইহাদের কার্যকারিতা দেহান্তরে রূপান্তরে তাঁহার জীবনে শেষ দিন পর্যন্ত চলিয়াছে।

৬

রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহার পক্ষে বড় আনন্দের নয়। স্কুলের লেখাপড়ায় কোনোদিন তিনি মন দিতে পারেন নাই। স্কুল পরিবর্তন করিয়া যখন কোনো সুফল হইল না, তখন কর্তৃপক্ষ হতাশ হইয়া তাঁহার আশা ছাড়িয়া দিলেন; রবীন্দ্রনাথও যেন নিষ্কৃতি পাইলেন।

স্কুলের এই তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণ কি? আগেই বলিয়াছি, শৈশব হইতেই প্রকৃতির প্রতি একটা অন্ধ আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের ছিল। বাড়িতে বসিয়া আড়ালে-আবডালে প্রকৃতির যে রূপ দেখিতে পাইতেন, স্কুলে গিয়া তাহাও যেন তাঁহার কাছে লুপ্ত হইয়া গেল। প্রকৃতির স্পর্শহীন স্কুল-অট্টালিকার নীরস শুষ্ক জঠরের মধ্যে কিছুতেই তিনি আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না। এই প্রকৃতির স্পর্শের অভাবও কতক পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে যদি তাহার বদলে মানুষের প্রীতি পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের দেশের স্কুলগুলিতে তাহারও অভাব। সেখানে মানুষ দুইটি মাত্র শ্রেণীতে বিভক্ত; ছাত্র ও শিক্ষক। কিন্তু এ বিভাগ তো একান্ত কৃত্রিম। সংসারে কেহ ছাত্র ও শিক্ষকরূপে

জন্মগ্রহণ করে না; সংসারের বিভাগ পুত্র কন্যা, পিতা মাতা, ভাই বন্ধুরূপে। কিন্তু স্কুলে তাহা কোথায়? পিতা মাতা, পুত্র কন্যার স্পর্শ হৃদয়ে হৃদয়ে; ছাত্র শিক্ষকের স্পর্শ মাথায় মাথায়; এই মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকির মধ্যে বুদ্ধির স্পর্ধা আছে, অন্তরের টান নাই। কাজেই এখানে তিনি প্রকৃতির স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইলেন, তৎপরিবর্তে মানুষের অন্তরের স্বাদও পাইলেন না। ফলে স্কুল-জীবন তাঁহার কাছে দুঃসহ হইয়া উঠিল।

প্রত্যেক কল্পনাপ্রবণ বালকেরই হয়তো স্কুল-জীবনে প্রথমে এমন অভিজ্ঞতা ঘটে, কিন্তু অভ্যাসের আবর্তনে ও কর্তৃজনের তাড়নায় শীঘ্রই তাহারা এই অবস্থায় অভ্যস্ত হইয়া যায়; শেষে অস্বাভাবিকটাই তাহাদের কাছে স্বাভাবিক হইয়া ওঠে; আবার তাহারা শিক্ষকশ্রেণীতে পরিবর্তিত হইয়া কোমলমতি বালকদিগকে অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক করিয়া লইতে শিক্ষা দেয়। এ এক বিষম বিষচক্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না, কর্তৃপক্ষও তেমন গরজ দেখাইলেন না, ফলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক হইয়াই রহিল।

পরিণত বয়সে এই দুঃখের অভিজ্ঞতা তিনি ভুলিতে পারেন নাই বলিয়া দেশের বালকদের রক্ষা করিবার জন্য যে বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন তাহা প্রচলিত প্রথার রীতি-মত স্কুল নয়। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত; এখানকার চরম বিভাগ ছাত্র ও শিক্ষক নয়; ইহা একটি সুবৃহৎ আশ্রম-পরিবার। নিজ নিজ পরিবার হইতে ছিন্ন হইয়া আসিয়া বালকেরা এই বৃহৎ পরিবারের

অন্তর্গত হইয়া কতক পরিমাণে পারিবারিক স্নেহস্পর্শ পায়। এই বিদ্যালয়ে প্রকৃতি ও মানুষে হাত মিলাইয়া বালকদিগকে গড়িয়া তোলে। কিন্তু কেবল প্রকৃতি ও মানুষে মিলিয়া রবীন্দ্রনাথের জগৎ নয়—প্রকৃতি, মানুষ ও ভগবান এই তিন সত্তা মিলিয়া তাঁহার জগতের সম্পূর্ণতা। শান্তিনিকেতনে সাম্প্রদায়িকতানির্মুক্ত ভগবানের বিশুদ্ধ রূপের শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা আছে। যখন দেশের প্রচলিত স্কুলগুলি হইতে প্রকৃতি ও ভগবান নির্বাসিত, মানুষেরও মাত্র খণ্ডিত অস্বাভাবিক সম্বন্ধ, সেই সময়ে তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে এই তিন সত্তাকে সম্মিলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা দেশের শিক্ষা-প্রথায় যে কতবড় যুগান্তর, অস্বাভাবিক অবস্থায় আমরা অত্যন্ত অভ্যস্ত না হইয়া গেলে তাহা বুঝিতে পারিতাম। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যের মধ্যে পূর্ণতার প্রতি যে আগ্রহ আছে, সেই পূর্ণতারই বাস্তব প্রকাশ শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয়ের জীবন।

স্কুলের পড়ায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ উপকার হয় নাই বটে, কিন্তু সে ক্ষতি পূরণ হইয়া গিয়াছিল বাড়ির পড়ায় ও বাড়ির আবহাওয়ায়। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া কুস্তি শিক্ষা হইতে আরম্ভ কবিয়া রাত্রি নয়টা পর্যন্ত তাঁহার আর বিরাম ছিল না। কখনো বাংলার মাস্টার, কখনো সংস্কৃতের, কখনো বা ইংরেজির; তাহা ছাড়া বিজ্ঞান ছিল, ব্যাকরণ ছিল, শারীরতত্ত্ব ছিল; সংগীত তো ছিলই। সব বিষয় যে তাঁহার সমান ভালো লাগিত এমন নয়; যে-বিষয়ে রস পাইতেন তাহাতে অগ্রসর হইয়া যাইতেন; যে বয়সে

তিনি কুমারসম্ভব পড়িয়া অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা সাধারণ বালকের ঋজুপাঠ পড়িবার বয়স।

কিন্তু বাড়ির পড়ার চেয়ে বাড়ির আবহাওয়ায় তাঁহার বেশি উপকার হইয়াছিল। তৎকালে ঠাকুরবাড়ি বাংলা দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সর্বাগ্রণী ছিল। দেশের যত গুণী জ্ঞানী সকলের যাতায়াত ছিল সেখানে; সংগীত, অভিনয়, কাব্যচর্চা নানাদিক দিয়া নাড়া খাইয়া বালকের মন প্রত্যুষেই জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং তার পরে আর কোনোদিন ঘুমাইয়া পড়ে নাই।

ছেলেবেলায় আমার একটা মস্ত সুযোগ এই ছিল যে, বাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের হাওয়া বহিত।... আমার খুড়তুত ভাই গণেন্দ্রদাদা তখন রামনারায়ণ তর্কবত্নকে দিয়া নবনাটক লিখাইয়া বাড়িতে তাহার অভিনয় করাইতেছেন। সাহিত্য এবং ললিতকলায় তাঁহাদের উৎসাহের সীমা ছিল না। বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশে ভূষায় কাব্যে গানে চিত্রে নাট্যে ধর্মে স্বাদেশিকতায় সকল বিষয়েই তাঁহাদের মনে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিয়াছিল।— জীবনস্মৃতি, "বাড়ির আবহাওয়া"

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় যে বহুমুখিতা আছে, পূর্ণজীবনের প্রতি যে একটা আকর্ষণ আছে, বালককালের এই অভিজ্ঞতাই তাহার মূলে, এ-কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

বড়দাদা তখন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পাতিয়া সামনে একটি ছোট ডেক্‌স লইয়া স্বপ্নপ্রয়াণ লিখিতেছিলেন।... তখনকার এই কাব্যরসের ভোজে আড়াল-আবডাল হইতে আমরাও বঞ্চিত হইতাম না। এত ছড়াছড়ি যাইত যে, আমাদের মতো প্রসাদ আমরাও

পাইতাম।... সমুদ্রের রত্ন পাইতাম কিনা জানি না, পাইলেও তাহার মূল্য বুঝিতাম না, কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম— তাহারি আনন্দ-আঘাতে শিরা-উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত।— জীবনস্মৃতি, "বাড়ির আবহাওয়া"

বাড়ির আবহাওয়ায় নানাদিক হইতে নানারকমের তরঙ্গ তাঁহার উপরে আসিয়া পড়িয়া তাঁহার কবি-মনকে নানাদিক হইতে উৎসুক করিয়া তুলিয়াছিল। বাড়ির এক-একজনের এক-একদিকে বিশেষ আগ্রহ ছিল। কাহারও কাব্যে, কাহারও সংগীতে, কাহারও চিত্রে, কাহারও তত্ত্বে, কাহারও ধর্মে এবং স্বাদেশিকতায়— এ সমস্তই যেন একাধারে এই বাড়ির একটি বালকের মধ্যে আসিয়া বর্তিয়াছে। বাড়ির এই বহুমুখী, নিয়তজাগ্রত, পূর্ণতা-প্রয়াস আবহাওয়াই রবীন্দ্রনাথের জীবনতন্ত্র গঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৭

রবীন্দ্রনাথ বলিতেন, অনেক লেখক চরিত্র সৃষ্টি করিবার সময়ে বাস্তব মানুষের একটা রূপ সামনে রাখেন, তাহার উপরে রং ফলাইয়া কারিগরি করিয়া তাঁহারা নূতন চরিত্র গড়িয়া তোলেন—কিন্তু তাঁহার চরিত্রসৃষ্টির সময়ে সম্মুখে তেমন কোনো বাস্তব মানুষ থাকিত না। ইহা অংশত সত্য হইলেও সর্বতোভাবে সত্য বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার রচনার মধ্যে অনেক চরিত্র দেখা যায়, যাহাদের বাস্তব রূপ 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে আছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহার বাল্যকালে দেখা অনেক মানুষ পরিবর্তিত হইয়া তাঁহার কাব্যে নূতন জন্মলাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে ঠাকুরদাদা বলিয়া সর্বজনপ্রিয়, ছোটো বড়ো সকলের সমানভাবে সাথী, সংগীতমুখর ও সুরসিক একটি চরিত্র আছে। এই ঠাকুরদাদা, অবস্থাভেদে দাদাঠাকুর, দাদা প্রভৃতি নানা নাম ধারণ করিয়াছে। এই পর্যায়ের আরম্ভ বোধ করি 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর বসন্ত রায়ে। এই চরিত্রটি কবির জীবনের পরিণীতির সঙ্গে অভিব্যক্ত হইতে হইতে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া শেষ পর্যন্ত চলিয়াছে। এই চরিত্রের বাস্তব মূল 'জীবনস্মৃতি'র শ্রীকণ্ঠ সিংহ। এই বৃদ্ধ ভক্ত তাঁহাদের পরিবারের বন্ধু ছিলেন। মহর্ষির সঙ্গেও যেমন অনায়াসে তিনি মিশিতে পারিতেন, তেমনি অনায়াসে মিশিবার তাঁহার শক্তি ছিল মহর্ষির কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত; বাড়ির ছেলেবুড়া সকলের তিনি সমানবয়সী ছিলেন। তাঁহার নিত্যসঙ্গী ছিল সেতার, মুখে তাঁহার সর্বদা সংগীত। এই সংগীতরসিক, অজাতশত্রু, সকলের সমবয়সী বন্ধুই, কবির সৃষ্ট ঠাকুরদাদা চরিত্রের বাস্তব মূল বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথকে তাঁহার 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র বৈকুণ্ঠ বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। বৈকুণ্ঠের পাণ্ডিত্য, রচনার বাতিক, তাহার দুরূহ রচনা শুনিবার লোকের অভাব, আবার রচনা শুনিবার নাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে টাকাপয়সা আদায়, সংসারে অনভিজ্ঞতা প্রভৃতি সমস্তই দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনে ঘটিয়াছিল।

'চিরকুমার সভা'র চন্দ্রমাধব চরিত্রের বাস্তব উপাদান সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন—

চন্দ্রমাধববাবুর চরিত্রে অনেক মিশল আছে, তার মধ্যে কতক মেজদাদা [সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর] কতক রাজনারায়ণবাবু এবং কতক

আমার কল্পনা আছে। নির্মলাও তথৈবচ— এর মধ্যে সরলার অংশ অনেকটা আছে বটে। কিন্তু কোন রিয়াল্ মানুষ প্রত্যহ আমাদের কাছে যে-রকম প্রতীয়মান সে-রকমভাবে কাব্যে স্থান পাবার যোগ্য নয়।.. চন্দ্রমাধবে মেজদাদার শিশুবৎ স্বচ্ছসারল্যের ছায়া আছে এবং নির্মলার সরলার কল্পনাপ্রবণ উদ্দীপ্ত কর্মোৎসাহ আছে— কিন্তু উভয় চরিত্রেই অনেক জিনিষ আছে যা তাঁদের কারোই নয়।"

—বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫০, "পত্রাবলী"

'চিরকুমার সভা'র অক্ষয় চরিত্রও তুই চরিত্রের মিশলে সৃষ্টি। 'জীবনস্মৃতি'র অক্ষয় চৌধুরী ও কিশোরী চাটুজ্যের সঙ্গে কবির কল্পনা মিশিয়া অক্ষয়কে রচনা করিয়াছে। অক্ষয় চৌধুরীর কবিত্বশক্তি, কাব্যানুরাগ, বাক্‌পটুতার সঙ্গে কিশোরী চাটুজ্যের সংগীত-তৎপরতার মিশ্রণে চিরকুমার সভার অক্ষয়ের সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে তাঁহাদের বাড়িতে একটি বালক ভৃত্য ছিল,

তার নাম শ্যাম, বাড়ি যশোরে, খাঁটি পাড়াগেঁয়ে, ভাষা তার কলকাতায়ী নয়।.. তার রং ছিল শ্যামবর্ণ, বড়ো বড়ো চোখ, তেলচুকচুকে লম্বা চুল, মজবুত দোহারা শরীর। তার স্বভাবে কড়া কিছুই ছিল না, মন ছিল সাদা। ছেলেদের পরে তার ছিল দরদ।— ছেলেবেলা, ৬

ঠিক এই রকম একটি ভৃত্যের বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পে।

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে, তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি। লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিক্কণ ছিপছিপে বালক।

খুব সম্ভব বাস্তব শ্যাম কালক্রমে গল্পের রাইচরণে পরিণত হইয়াছে।

৮

'ছেলেবেলা' গ্রন্থে বালক রবীন্দ্রনাথের কাজকর্মের যে পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, তাহাতে এই বালককে একেবারে নিজেদের ঘরের বলিয়া মনে হয়। পরিণত রবীন্দ্রনাথকে ঘরের বলিয়া কে কল্পনা করিতে পারে। ইস্কুলের পণ্ডিতমহাশয়ের ইঙ্গিতে এই বালক একদিন নিজেদের বাড়ি হইতে কেয়া-খয়ের 'অপহরণ' করিয়াছিল। আবার ইস্কুল হইতে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চিংড়িমাছের চচ্চড়ি দিয়া লঙ্কামাখা পান্তাভাত খাইত। সরু করিয়া সুপারি কাটায় তাহার নাকি দক্ষতা ছিল। আর শিলাইদহে সেই ফুলের রস দিয়া কবিতা লিখিবার চেষ্টা! এ যে নিতান্ত ছেলেমানুষি। ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ই যে ছেলেবেলা গ্রন্থে।

কিন্তু এ কেমন ছেলেমানুষ! কিশোর কবির মনে ও কাব্যে পরিণত মহাকবির কাব্যের সব ভাব যেন ছায়াশরীরী আকারে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

য়ুরোপীয় সমালোচকগণ তাঁহাদের দেশের লেখকদিগকে মনের গঠন অনুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন, জাতীয় ও য়ুরোপীয়; এক দল লেখকের রচনায় জাতীয় উপাদান অধিক, অপর দলের রচনায় য়ুরোপীয় উপাদান। এই দুই শ্রেণীকে অল্প পরিবর্তিত করিয়া বলা যাইতে পারে— জাতীয় ও সর্বমানবীয়।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে সর্বমানবীয় উপাদান অধিকতর। মানুষকে জাতি-দেশ-সম্প্রদায়-নির্মুক্ত বিশুদ্ধ মানবমাত্ররূপে দেখিবার

সহজাত শক্তি লইয়াই যেন তিনি জন্মিয়াছিলেন। ইহা বৈদেশিক সংস্কৃতি বা বিদেশভ্রমণের ফলে সঞ্জাত নহে—কারণ বিদেশ গমনের পূর্বেই তাঁহার কৈশোরের রচনাতে প্রভূত পরিমাণে ইহা লক্ষ্য করা যায়।

প্রসঙ্গত, এখানে মধুসূদনের সঙ্গে তাঁহার এ-বিষয়ে প্রভেদ তুলনীয়। মাইকেল মধুসূদন কিশোর বয়স হইতে বৈদেশিক সংস্কৃতির মধ্যে ডুবিয়াছিলেন; তাঁহার বিলাত গমনের অস্বাভাবিক (সেকালের পক্ষে স্বাভাবিক) আগ্রহের ফলে বিদেশ গমনের পূর্বেই বিদেশই যেন তাঁহার দেশ হইয়া গিয়াছিল; ধর্মে সংস্কৃতিতে ভাষায় তাহাকে বিদেশীই বলিলেই যেন চলে। কিন্তু লেখক হিসাবে তাঁহার ধাত ছিল জাতীয় লেখকের; তিনি তৎস্থানিক ও তৎকালিকের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই বলিয়া মানুষের বিশুদ্ধ রূপ দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই; তাঁহার রাম, রাবণ, লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ—সকলেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালী।

কৈশোরে বৈদেশিক সংস্কৃতির সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় মাইকেলের মত গভীর ছিল না, কিন্তু সহজাত শক্তির বলেই তিনি অনায়াসে যেন তৎকালিক ও তৎস্থানিকের ঊর্ধ্বে উঠিয়া বিশুদ্ধ মানুষকে দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কৈশোরে বিলাতে গিয়া সেখানকার মানুষকে দেখিয়া তাঁহার এই সহজাত বোধ সমর্থিত হইয়াছিল মাত্র। যে ইংরেজ-পরিবারে তিনি ছিলেন তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন—

এই পরিবারে বাস করিয়া একটি জিনিস আমি লক্ষ্য করিয়াছি—মানুষের প্রকৃতি সব জায়গাতেই সমান। আমরা বলিয়া থাকি এবং

আমিও তাহা বিশ্বাস করিতাম যে, আমাদের দেশে পতিভক্তির একটা বিশিষ্টতা আছে, য়ুরোপে তাহা নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সাধ্বী গৃহিণীর সঙ্গে মিসেস স্কটের আমি তো বিশেষ পার্থক্য দেখি নাই।— জীবনস্মৃতি, "বিলাত"

ভিন্ন দেশের আচার-ব্যবহার-প্রথা ভেদ করিয়া মানুষের অন্তরতর রূপটি দেখা, বিশেষ এত অল্পবয়সে, সহজ কথা নয়— ইহার জন্য সহজাত শক্তির প্রয়োজন।

'ছেলেবেলা' গ্রন্থে এই ভাবটিকে আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিতেছেন—

আমি য়ুনিভর্সিটিতে পড়তে পেরেছিলুম তিন মাস মাত্র। কিন্তু আমার বিদেশের শিক্ষা প্রায় সমস্তটাই মানুষের ছোঁওয়া লেগে। আমাদের কারিগর সুযোগ পেলেই তাঁর রচনায় মিলিয়ে দেন নূতন নূতন মালমসলা। তিন মাসে ইংরেজের হৃদয়ের কাছাকাছি থেকে সেই মিশোলটি ঘটেছিল। আমার উপরে ভার পড়েছিল রোজ সন্ধে-বেলায় রাত এগারোটা পর্যন্ত পালা করে কাব্য নাটক ইতিহাস পড়ে শোনানো। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে অনেক পড়া হয়ে গেছে। সেই পড়া ক্লাসের পড়া নয়। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের মিলন। বিলেতে গেলেম, ব্যারিস্টর হই নি। জীবনের গোড়াকার কাঠামোটাকে নাড়া দেবার মত ধাক্কা পাই নি, নিজের মধ্যে নিয়েছি পূর্ব-পশ্চিমের হাত-মেলানো। আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে।— ছেলেবেলা, ১৪

রবীন্দ্রনাথের জীবনের গোড়াকার কাঠামোটাই যে সর্ব-মানবীয় উপাদানে রচিত। এইদিকে স্বাভাবিক প্রবণতা না থাকিলে কেহ এত অল্পবয়সে এমন অনায়াসে বৈদেশিক আবহাওয়ার কুয়াশা ভেদ করিয়া জাতি-দেশ-

সম্প্রদায়-নির্মুক্ত বিশুদ্ধ মানুষের রূপ দেখিতে পায় না। সর্বমানবীয়তা তাঁহার সাহিত্যের প্রধান উপাদান বলিয়াই বিদেশের পক্ষে তাঁহাকে বুঝিতে পারা বোধ করি এত সহজ হইয়াছিল। আবার তাঁহার কাব্যে তৎস্থানিকতা গৌণ বলিয়াই দেশের লোকের পক্ষে তাহা অকুণ্ঠিতভাবে গ্রহণ করিতে বোধ করি এমন বিলম্ব হইয়াছিল। রবীন্দ্র-কাব্যে 'বিশ্ববোধ' কবির জীবনের পরিণতির সঙ্গে পল্লবিত পুষ্পিত হইয়াছে মাত্র; কিন্তু অঙ্কুররূপে তাহা গোড়া হইতেই বর্তমান ছিল।

বন-ফুল

'বন-ফুল রবীন্দ্রনাথ-লিখিত সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ। ইহা ১২৮৬ সালে প্রকাশিত হয়'। কিন্তু ইহার 'রচনাকাল অন্তত আরও চার বৎসর পূর্বে'— তখন কবির বয়স চৌদ্দ হইতে পনেরোর মধ্যে।

প্রথম মুদ্রণের পরে এই গ্রন্থ বহুকাল আর মুদ্রিত হয় নাই। এক্ষণে রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে ছাপা হইয়াছে। সাধারণ পাঠকের কাছে এই কাব্য অজ্ঞাত বলিয়া আলোচনা করিবার আগে ইহার গল্পাংশ ও তাহার বিশ্লেষণ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

হিমালয়ের পাদদেশে এক নির্জন বনে পিতাপুত্রী বাস করিত। পিতার মৃত্যুতে কন্যা যখন নিজেকে অসহায় বলিয়া মনে করিতেছে তখন বিজয় নামে এক যুবক অসহায় কমলাকে সঙ্গে করিয়া মানুষের সংসারে আনিল। ইতিপূর্বে কমলা নিজেদের ছাড়া অন্য মানুষ দেখে নাই; পিতার কাছে তাহাদের কথা শুনিয়াছে মাত্র। বিজয় কমলাকে বিবাহ করিল। বিজয়ের এক কবি-বন্ধু ছিল নীরদ। সে কমলাকে ভালোবাসিয়া ফেলিল; কমলাও তাহাকে ভালোবাসিল; কমলা সংসার-বিষয়ে অনভিজ্ঞ বলিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চায়, নীরদ বিবাহ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে সম্মত নহে। নীরজা নামে আর একটি মেয়ে আছে, যে বিজয়কে ভালবাসে, কিন্তু বিজয়ের মন কমলাতে, কাজেই নীরজার কাঁদা ছাড়া আর উপায় নাই। এদিকে বিজয় জানিতে পারিল যে, কমলা নীরদকে

ভালবাসে, তাই সে নীরদকে সংসার ত্যাগ করিতে উপদেশ দিল। সন্ন্যাসীবেশে নীরদ যখন বনে চলিয়াছে, কমলাও তাহার অনুগামী হইতে চায়। ঠিক সেই মুহূর্তে বিজয় নীরদকে ছুরিকাঘাত করিয়া পলাইল। নীরদের মৃত্যু হইলে কমলা তাহার সৎকার করিয়া সংসার ছাড়িয়া পুরাতন সেই বনে প্রস্থান করিল। কিন্তু পুরাতন বন-প্রকৃতি আর তাহাকে আগের মতো আনন্দ দিতে পারিতেছে না দেখিয়া ভগ্নহৃদয়ে কমলা হিমালয়শৃঙ্গে প্রাণত্যাগ করিল।

বন-ফুল কাব্যের ইহাই গল্পাংশ। কাব্যটি আটটি সর্গে সম্পূর্ণ। এবারে এই আট সর্গের বিশ্লেষণ প্রদত্ত হইল।

প্রথম সর্গে হিমালয়ের পাদদেশের কাননে কমলার পিতার মৃত্যু ও কমলার অসহায় অনুভূতি। হিমালয়ের বর্ণনায় বিহারীলালের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় সর্গে কমলার কুটিরে শ্রান্ত পথিক বিজয়ের আগমন। মানুষ দর্শনে কমলার বিস্ময়। বিজয় কর্তৃক কমলার পিতার দেহ সমাহিত। কমলাকে লইয়া বিজয়ের বনত্যাগ করিয়া সংসারে আগমন। বিজয়ের দর্শনে কমলার বিস্ময়ের সহিত ফার্দিনান্দ দর্শনে মিরান্দার বিস্ময় তুলনীয়। কমলার বন হইতে বিদায় দৃশ্যে শকুন্তলার অনুরূপ দৃশ্যের প্রভাব পড়িয়াছে। টেম্পেস্ট-এর প্রভাব প্রত্যক্ষ কি কাকতালীয় সংশয়ের বিষয় হইলেও শকুন্তলার প্রভাব সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই। তৃতীয় সর্গে কমলা ও নীরজার কথোপকথন। কমলা কর্তৃক তাহার পূর্ব-ইতিহাস ব্যাখ্যান। অন্তরাল হইতে কমলার প্রতি

বনফুলের কবি

নীরদের গানে প্রেমনিবেদন। প্রেমের জ্বালা সম্বন্ধে কমলার চৈতন্য। কমলা ও নীরজার কথোপকথনের সঙ্গে মেঘনাদবধ কাব্যের সীতা ও সরমার কথোপকথন তুলনীয়; ইহা সচেতন প্রভাব বলিয়াই মনে হয়। চতুর্থ সর্গে বিজয় ও কমলার বিবাহ। নীরদ কর্তৃক বিবাহিত কমলার প্রেম প্রত্যাখ্যান। বিবাহের প্রকৃতি সম্বন্ধে কমলার অজ্ঞতার সঙ্গে উক্ত বিষয়ে কপালকুণ্ডলার অজ্ঞতা তুলনীয়। কমলাকে প্রত্যাখ্যান করিবার সময়ে নীরদের ভাষার সঙ্গে শৈবলিনীকে প্রত্যাখ্যানে প্রতাপের ভাষার ঐক্য আছে। পঞ্চম সর্গে বিজয়ের প্রতি হতভাগ্য নীরজার ব্যর্থ প্রেম। ষষ্ঠ সর্গে নীরদকে ভালোবাসিতে কমলা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, ইহা বিজয়কে জ্ঞাপন। নীরজা কমলাকে জানাইল, সে বিজয়কে ভালোবাসে। বিজয়ের আদেশে নীরদের সন্ন্যাসীবেশে সংসারত্যাগ। কমলার অনুগমনের ইচ্ছা। নীরদকে বিজয়ের ছুরিকাঘাত। নীরদের খেদ ও মৃত্যু। কমলার শোক ও নিজেকে বিধবা বলিয়া বর্ণনা। এই সর্গে সংসারের একটি আদর্শরূপের বর্ণনা আছে—কবির সত্যযুগ। এই সত্যযুগ বা আদর্শ জগৎ 'য়ুটোপিয়া'-র আভাস মেঘদূতে আছে, শেলির অনেক কবিতায় আছে; এমন সত্যযুগের বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্যেও আছে। এ ক্ষেত্রে মেঘদূতের অলকা ও শেলির আদর্শ জগৎ মিলিয়া একটি আদর্শ যুগের সৃষ্টি করিয়াছে। সপ্তম সর্গে নীরদের চিতাগ্নির পাশে কমলা। কমলার মূর্ছা। মূর্ছান্তে শ্মশান ত্যাগ। শ্মশান বর্ণনার দৃশ্যে হেমচন্দ্রের শ্মশান-বর্ণনার প্রভাব পড়িয়া থাকিতে পারে, কারণ, এক-একটা ছত্রের মিল কেবল আকস্মিক বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু মোটের

উপরে চৌদ্দ বছর বয়সের কবির বর্ণনা হেমচন্দ্রের বর্ণনার চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের। অষ্টম সর্গে কমলার পুরাতন বনে প্রত্যাগমন। সে বন যেন আর আগের মত জীবন্ত নয়; হরিণ পশু পাখি কমলাকে আর আপন মনে করে না—কমলাকে দেখিয়া তাহারা ভয়ে প্রস্থান করে। দুঃখে হিমালয়শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া কমলার মৃত্যু। হিমালয়-বর্ণনায় বিহারীলালের প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

রবীন্দ্রনাথের কৈশোরের বন-ফুল, কবি-কাহিনী, ভগ্নহৃদয় প্রভৃতি কাব্য আলোচনার সময়ে মনে রাখিতে হইবে, তখন কবি বালকমাত্র ছিলেন; আবার এই বালক পরবর্তী জীবনে পৃথিবীর মহাকবিদের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। একাধারে এই দুইটি তথ্য মনে না রাখিলে এই কাব্যগুলির আলোচনা সার্থক হইতে পারে না। বাল্যবয়সের অপরিণতি কাব্যগুলিতে প্রচুর আছে, আবার পরিণতবয়সের মহীরুহের অঙ্কুরও নিঃসন্দেহ এগুলিতে বিদ্যমান। রবীন্দ্র-কাব্যের পরিণাম না জানিলে এসব কাব্যের সার্থকতা কোনো পাঠক উপলব্ধি করিতে পারিবেন না; তাঁহার জীবনের পরবর্তী পরিণামের পটভূমিতে দাঁড় করাইতে পারিলে তবেই ইহাদের দৌর্বল্য ও গুরুত্ব বুঝিতে পারা যাইবে। কাব্য হিসাবে রচনাগুলি অত্যন্ত কাঁচা; এত কাঁচা যে, কবি তাঁহার কাব্যসংগ্রহ হইতে এগুলিকে নির্বাসিত করিয়া রাখিয়াছিলেন—কিন্তু পরবর্তী কবিজীবনের দলিল হিসাবে ইহাদের স্থান এত পাকা যে, একমুহূর্তের জন্যও ইহাদের নির্বাসন কল্পনা করা যায় না। রসিক পাঠকের পক্ষে এসব কাব্যপাঠ অপরিহার্য

নয়, কিন্তু কবিজীবনের প্রতি আগ্রহশীল পাঠকের এগুলি অপরিহার্য প্রাথমিক দলিল।

বন-ফুল হইতে সন্ধ্যাসংগীতের পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্র-কাব্যের পর্বকে কবির বাহন-অনুসন্ধান-পর্ব বলা যাইতে পারে। কবি নানাজাতীয় কাব্যের মধ্যে যে নিজের শক্তি পরীক্ষা করিতেছেন, তাঁহার সেই কবিশক্তির যোগ্য বাহন কি? সে বাহন কি কাহিনী-কাব্য বা 'ন্যারেটিভ', না নাটক, না খণ্ডকাব্য বা 'লিরিক'? তাঁহার যোগ্যতম বাহন যে লিরিক, কবি সে-বিষয়ে প্রথমে সচেতন ছিলেন না; পরীক্ষা করিয়া করিয়া অবশেষে এই সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন মাত্র। প্রথমে তিনি কাহিনী-কাব্য দিয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন, বন-ফুল ও কবি-কাহিনী। বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্য; রুদ্রচণ্ড নাটক। আবার ভগ্নহৃদয় গীতিকাব্য হইলেও তাহার সঙ্গে নাটকেব মিশল আছে। এই কাব্যের প্রারম্ভে নাটকের পাত্রপাত্রী-তালিকার মতো কাব্যের পাত্রগণের উল্লেখ আছে। পাছে ইহাকে কেহ নাটক মনে করে, তাই কবিকে ভূমিকায় বলিয়া দিতে হইয়াছে যে, ইহা নাটক নয়, কাব্য।

শৈশবসংগীত লিরিক বা খণ্ডকাব্য। ইহার অধিকাংশ কবিতা কবির তেরো হইতে আঠারো বছর বয়সের মধ্যে রচিত। ইহারই গা ঘেঁসিয়া সন্ধ্যাসংগীত। সন্ধ্যাসংগীতে আসিয়া কবিমন অবচেতনভাবে বুঝিতে পারিল, কাহিনী-কাব্য নয়, লিরিক বা খণ্ডকাব্যই তাঁহার শক্তির যথার্থ ও প্রধান বাহন। জীবনস্মৃতিতে সন্ধ্যাসংগীত সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন—

এইরূপে যখন আপন মনে একা ছিলাম তখন, জানি না কেমন করিয়া, কাব্যরচনার যে সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া

গেল। আমার সঙ্গীরা যে-সব কবিতা ভালোবাসিতেন ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যে-সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধ করি, তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনাআপনি সেই সকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তি লাভ করিল। ..

কিন্তু এমনি করিয়া দুটো একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের আবেগ আসিল। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল—বাঁচিয়া গেলাম। যাহা লিখিতেছি, এ দেখিতেছি সম্পূর্ণই আমার। ..

আমার কাব্যলেখার ইতিহাসের মধ্যে এই সময়টাই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে স্মরণীয়।—জীবনস্মৃতি, "সন্ধ্যাসংগীত"

সন্ধ্যাসংগীত-পর্ব সবচেয়ে স্মরণীয়, কারণ ইহা তাঁহার যথার্থ বাহন লাভের সময়; ইহা তাঁহার কবিজীবনের বাল্মীকির আদি শ্লোক। কত রকম বাহন পরীক্ষার পরে যেমনি সন্ধ্যা-সংগীতের বিশুদ্ধ গীতিকবিতায় আসিয়া পৌঁছিলেন, অমনি তাঁহার অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল— বাঁচিয়া গেলাম।

অনেক মহাকবিকেই জীবনের আদিপর্বে কিছুটা সময় বাহন-নির্বাচনে ব্যয় করিতে হইয়াছে। বিশেষ, যে-সময় রবীন্দ্রনাথ কবিজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন বাংলা সাহিত্যে কাহিনী-কাব্যের যুগ। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রভাবে বাঙালী কবিরা তখন মহাকাব্য লিখিতেছিল, যে আর কিছু না পারিত, সে একখানা মহাকাব্য লিখিয়া ফেলিত। মাইকেল-হেমচন্দ্রের ঘটনাপ্রধান, বহির্মুখী মহাকাব্য, বিহারীলালের ঘটনাবিরল, গীতিপ্রধান, অন্তর্মুখী দীর্ঘ কাব্য; এই দুইয়ের প্রভাব রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে কাহিনী-কাব্যের পথে পরিচালিত করিয়াছিল। অবশ্য, মাইকেল-হেমচন্দ্রের চেয়ে বিহারীলালের কাব্যের প্রভাবই তাঁহার কাহিনী-কাব্যে অনেক বেশি।

কিন্তু আমার বিশ্বাস, দেশের ইতিহাসে মহাকাব্য রচনার এই অনুমোদন না থাকিলেও রবীন্দ্রনাথ নিজ কবিপ্রকৃতির সমর্থনেই এই জাতীয় শিথিলবন্ধ, গীতিপ্রধান, কাহিনী-কাব্য দিয়া নিজ কবিজীবনের সূত্রপাত করিতেন। এ-বিষয়ে আমার নজির, ইংরেজ রোমান্টিক কবিগণের জীবনের আদিপর্ব। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীট্‌স্— অল্পবয়সেই এই তিন কবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হইয়াছিল ; বিশেষ শেলির সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের চিহ্ন কবি-কাহিনীতে আছে— এই সময়টাতে তিনি যেন শেলির কাব্য-পাঠশালায় শিক্ষানবিশি করিয়াছেন। এই তিন কবির সঙ্গে বাহিরের পরিচয় ও অন্তরের সমধর্মিতা রবীন্দ্রনাথকে পূর্বসূরীদের কাব্যপন্থায় টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীট্‌স্ তিনজনেরই আদিপর্বে দীর্ঘ কাহিনী-কাব্য ; আবার সকলেরই চরম সৃষ্টি সংক্ষিপ্ত গীতি-কবিতায়। তাঁহারা প্রত্যেকেই আদিপর্বের শেষদিকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দীর্ঘ কাব্য তাঁহাদের যথার্থ বাহন নয়, তাঁহাদের যথার্থ বাহন গীতিকবিতা।

এই সব শক্তিমান মহাকবিগণ যে কাহিনী-কাব্যে সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ দীর্ঘ কাহিনী লিখিতে গেলে যে-পরিমাণ ঘটনার প্রয়োজন হয়, তাঁহাদের কাব্যে তাহার অভাব। ঘটনার অভাব ভাবনা দ্বারা, সংঘাতের অভাব সংগীতের দ্বারা পূরণ করিবার চেষ্টা তাঁহারা করিয়াছেন। আবার, ঘটনার যে অভাব, তাহার কারণ বাস্তব সংসারের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয়ের অভাব। বাস্তব সংসার মানুষের সংসার— মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল। তাঁহাদের রোমান্টিক কল্পনা তির্যক্ গতিতে সংসারকে

স্পর্শ করিয়া যাইত মাত্র— সেই ক্ষণিক স্পর্শের মালা গাঁথিতে বসিলে মাঝে মাঝে ফাঁক থাকিবেই, সে ফাঁকগুলি গান দিয়া ভরিয়া দেওয়া ছাড়া উপায় কি ? তাই তাঁহাদের কাহিনী-কাব্য কেবল গানের মালা ; মাঝে মাঝে আকস্মিক ঘটনার টুকরা প্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয় না। রোমান্টিক কল্পনার ক্ষণিক পরিচয়ে ক্ষণিকের গান গাওয়া চলে ; কেবল নিজের সুখদুঃখ লইয়া দীর্ঘ কাহিনী-কাব্য রচনা করা চলে না। বিশেষ, কাহিনী-কাব্যে কাহিনীকে চালনা করিতে গেলে আত্মসংযম প্রয়োজন ; কাহিনীর পাত্রপাত্রীর জীবনের সুখদুঃখের কাছে কবির ব্যক্তিগত ভালো-লাগা মন্দ-লাগার সংযম। এই সব আত্মকেন্দ্রী, সংকীর্ণ-সংসারপরিচয়, মানবজ্ঞানহীন, মানবপ্রেমিক রোমান্টিক-ধর্মী কবিদের সে সংযম কোথায় ? কাহিনীর পাত্রপাত্রীর সুখদুঃখের জন্য তাঁহারা কি নিজেদের বক্তব্য স্থগিত রাখিবেন ? গান কি বন্ধ থাকিতে পারে ? গ্রীক দেবতাদের মতো সুদূর স্বর্গশিখরে নির্লিপ্তভাবে তাঁহারা নিজেদের গানে নিজেরা মশগুল। পৃথিবীতে সুখে-দুঃখে মানুষের লীলা ; মাঝে মাঝে হঠাৎ তাঁহারা অতর্কিত বজ্রের মত মানুষের সংসারে আসিয়া পড়িয়া তাহাদের জীবনের গতি অপরিহার্যের দিক হইতে নিজেদের অভীপ্সিত দিকে ফিরাইয়া দিয়া যান। ইহা তো লিরিকের ধর্ম, কাহিনী-কাব্যের ধর্ম তো ইহা নয়।

পূর্বোক্ত তিন কবিই অল্পদিনের মধ্যেই এই সত্যটি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের কবিধর্ম লিরিক রচনা, কাহিনী-কাব্য রচনা নয়। কেবল নিজের জীবনমাত্র সম্বলে কাহিনী-কাব্য রচনা করা সম্ভব নয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীট্‌সের মতোই এ কথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সমানভাবে প্রযোজ্য।

ইহা তো গেল তাঁহাদের কাহিনী-কাব্যের ঠাট বা টেকনিকের কথামাত্র। পূর্বোক্ত তিন কবির কাহিনী-কাব্যের বিষয়ের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের কাহিনী-কাব্যের বিষয়বস্তুর ঘনিষ্ঠ ঐক্য রহিয়াছে; ইংরেজ কবিত্রয়ের কাহিনী-কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু কবিজীবনের বিকাশ, রবীন্দ্রনাথের কাহিনী-কাব্যেরও প্রধান বিষয়বস্তুও তাই।

বন-ফুল কাব্যের মর্ম কি? কমলা ছিল বনফুল, বিজয় তাহাকে বন হইতে সংসারে আনিয়া ফেলিল, তাহাকে বিবাহ করিল। কমলা বিজয়ের পত্নী, আবার নীরদের প্রণয়িনী। বিবাহ ও প্রেমের মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে সে পারিল না, তাহার ফলে বিজয়, নীরদ, নীরজা ও তাহার নিজের জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেল। তখন সে শান্তি পাইবার আশায় পূর্বতন বনে হিমালয়ের পাদদেশে ফিরিয়া গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই পুরাতন আশ্রয় তাহাকে তো আর তেমনভাবে গ্রহণ করিল না। সে মানুষকেও পাইল না, প্রকৃতিকেও হারাইল। এমন হতভাগ্য জীবন বহনে অসমর্থ হইয়া হিমালয়শৃঙ্গে সে প্রাণত্যাগ করিল। দুষ্মন্ত কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া শকুন্তলা পূর্বতন বনে ফিরিয়া গেলে নিশ্চয়ই কমলার মতো নিঃসঙ্গ অনুভব করিত।

রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক কাব্যে পরবর্তী পরিণত কাব্যের অঙ্কুর আছে, এমন কথা পূর্বে বলিয়াছি। সেগুলি কি? বিবাহ ও প্রেম দুটি স্বতন্ত্র বস্তু; একটি সাংসারিক প্রথা, একটি মানসিক অবস্থা; বিবাহে মানুষ সীমাবদ্ধ, বেশি নড়িবার উপায় নাই; প্রেম মানসিক রসমাত্র বলিয়া এখানে তাহার

গতি অসীম, এখানে সে অবাধ। এই দুই বিপরীত সত্তাকে মিলিত করিতে পারা যায় কিনা সে চেষ্টা মানুষ বহুকাল হইতে করিতেছে। কোনো কোনো স্থলে বিবাহ ও প্রেম অকস্মাৎ একত্র হইলেও হইতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দুইয়ের মিলিত না হইবার আশঙ্কা। তখন মানুষের কর্তব্য কি? সে কি বিরাট হরধনুর বিপরীত কোটিতে গুণ পরাইতে গিয়া তাহাকে ভাঙিয়া ফেলিবে না? কিম্বা, যাহা স্বভাবত স্বতন্ত্র তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে রাখিয়া ভোগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মানুষ সেই পন্থা গ্রহণ করিবে? এই সমস্যাটি রবীন্দ্র-কাব্যের একটি মূল সমস্যা। কাব্যে নাটকে উপন্যাসে ঘুরিয়া ফিরিয়া এই সমস্যা কবির কাছে নূতন নূতন আলোকে প্রতিভাসিত হইয়াছে। এই সমস্যা চিত্রাঙ্গদায়, রাজা ও রানীতে, বিদায়-অভিশাপে, শেষের কবিতায় এবং বাঁশরীতে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

> আমার তো মনে হয়, আমার কাব্য রচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।— জীবনস্মৃতি, "প্রকৃতির প্রতিশোধ"

বিবাহ সাংসারিক প্রথামাত্র বলিয়া অসীম, প্রেম মানসিক রসমাত্র বলিয়া সীমাহীন— এ দুয়ের সামঞ্জস্যের চেষ্টা, ঐ সীমার মধ্যে অসীমের সমন্বয়ের চেষ্টা ছাড়া আর কি? রবীন্দ্র-কাব্যে সে সমন্বয় হইয়াছে কি না, বা কিরূপে হইয়াছে, তাহা বড় কথা নয়; সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রথম কাব্য হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের সায়াহ্ন পর্যন্ত এই সমস্যা কবিকে ভাবিত করিয়া রাখিয়াছে। এই সমস্যা পরবর্তী কবি-কাহিনী ও ভগ্নহৃদয়েও আছে।

দ্বিতীয় সমস্যা, কমলা তো একসময়ে প্রকৃতির কোলে দিব্য আরামে ছিল, তবে সংসার হইতে ফিরিয়া গিয়া সেখানে পূর্বতন আরাম পাইল না কেন? মাঝখানে যে সে মানুষের জীবনের স্বাদ লাভ করিয়াছে। মানুষের স্বাদ পাইবার আগে প্রকৃতিতে সে তৃপ্ত ছিল, এখন আর সে তৃপ্তি পাওয়া সম্ভবপর নয়। তবে কি মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে মিলনের উপায় নাই? এখানেও ঐ সীমা ও অসীমের প্রশ্নটা আসিয়া পড়ে। প্রকৃতির জগৎ স্বভাবতই অসীম, মানুষের জগৎ নানা অভ্যাস আচার ব্যবহার প্রথা ও কালের সংকীর্ণতার দ্বারা সীমাগ্রস্ত। অসীম ও সসীম মিলিবে কেমন করিয়া? ইহার উত্তর রবীন্দ্র-কাব্যে পাওয়া যাইবে। প্রকৃতি যখন মানুষের বিকল্প বা প্রতীক হইয়া উঠে, তখনই এক বিচিত্র উপায়ে মানুষে ও প্রকৃতিতে মিলন ঘটিয়া যায়—তখন কবি বলিতে পারেন, "মানবের রূপ হেরি প্রকৃতির মাঝে।" যখন কবি দেখিতে পান মানবের জীবনে ও প্রকৃতির জীবনে একই লীলা চলিতেছে, প্রকৃতির চাবিকাঠি দিয়া তিনি মানবের জীবনের একটির পরে একটি মহল খুলিয়া চলিতে পারেন, তখনই মানবে ও প্রকৃতিতে মিলন ঘটে। এই সমস্যাটিও রবীন্দ্র-কাব্যের একটি মূল সমস্যা— বন-ফুলে ইহার আভাস আর তাঁহার কাব্যে শেষদিন পর্যন্ত ইহা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। তবে প্রথম সমস্যাটির সঙ্গে দ্বিতীয়টির প্রভেদ এই যে, দ্বিতীয়টির স্পষ্ট সমাধান কবির কাব্যে পাওয়া যায়, প্রথমটির পাওয়া যায় না, কারণ প্রথম সমস্যা অনেক জটিলতর— বোধ করি তাহার কোনো সমাধান নাই। এই সমস্যাটিও কবি-কাহিনী কাব্যে আছে। বন-ফুলের

দুই বছর পরে কবি-কাহিনী রচিত, কিন্তু এই দুই বৎসরেই কবির শিল্প ও চিন্তাশক্তি দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে।

ইতিপূর্বে এই কাব্যে অন্যান্য কবিদের প্রভাবের বিষয় আভাসে বর্ণনা করিয়াছি— এক্ষণে তাহার বিস্তৃত আলোচনা বাঞ্ছনীয়। পরবর্তী জীবনে যাঁহারা মহাকবি হইয়াছেন, প্রথম বয়সে তাঁহাদিগকে অন্যান্য কবির কাছে শিক্ষানবিশি করিতে হইয়াছে। কবির কাব্যজীবন গঠনের আলোচনায় এই শিক্ষানবিশি পর্বটার বিশেষ গুরুত্ব। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বিহারীলালের প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন। বিহারীলাল ছাড়াও অন্য কবির প্রভাব আছে, হয়তো তাহার খুব বেশি গুরুত্ব নয় বলিয়া তিনি খুলিয়া বলেন নাই। অন্য কবির প্রভাব যতই থাক্‌, এই চৌদ্দ বৎসরের বালকের রচনায় এমন সব অংশও আছে যাহার উপরে ভাবী মহাকবির স্বাক্ষর অত্যন্ত সুস্পষ্ট; সে-সব অংশ বিহারীলাল হেমচন্দ্র লিখিতে পারিতেন না, এমন কি মধুসূদনের দ্বারাও লিখিত হইতে পারিত না। কাব্যালোচনায় সে-সব অংশের নিশ্চয় গুরুত্ব আছে, কিন্তু কবি-মন গঠনের ইতিহাসে পূর্ববর্তীদের প্রভাবের গুরুত্ব আরও বেশি।

প্রথম সর্গের হিমালয় বর্ণনা অনেকাংশে বিহারীলালের অনুকরণে লিখিত।

ঝঝরে নির্ঝর ছুটে, শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গে উঠে
দিগন্তসীমায় গিয়া যেন অবসান!
শিরোপরি চন্দ্র সূর্য, পদে লুটে পৃথ্বীরাজ্য
মস্তকে স্বর্গের ভার করিছে বহন;
তুষারে আবরি শির, দেখে খেলা পৃথিবীর
ভুরুক্ষেপে যেন সব করিছে লোকন।

আবার, হিমালয়ের পাদদেশে মানবের জীবন বর্ণনায় এমন সব অংশ আছে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়া যাহা লিখিত হইবার নয়। এই কাব্য লিখিবার আগে কবি হিমালয় ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন, কাজেই প্রয়োজনস্থলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব হয় নাই। কবির জীবনে এবারকার হিমালয় ভ্রমণটি বিশেষরূপে প্রভাবপ্রসূ হইয়াছে।

কুটীরের একপাশে, শাখা-দীপ ধূমশ্বাসে [১]
স্তিমিত আলোকশিখা করিছে বিস্তার।

দ্বিতীয় সর্গে বিজয়ের মধ্যে (তাহার পিতাকে ছাড়া) প্রথম মানব দর্শনে কমলার যে বিস্ময় তাহাতে ফার্দিনান্দ-দর্শনে মিরান্দার বিস্ময়ের আভাস আছে। হইতে পারে ইহা কাকতালীয়বৎ -- অনুরূপ ঘটনা অনুরূপ ভাবনার বিকাশ করিবে, অসম্ভব নহে। কিন্তু কমলার বন হইতে বিদায়ের দৃশ্যে শকুন্তলার বন-ত্যাগ দৃশ্যের প্রভাব যে আছে তাহাতে কোনো সংশয়ের অবকাশ নাই। শকুন্তলা কাব্যের সঙ্গে কবির পরিচয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, কিন্তু পরোক্ষ প্রমাণ অকাট্য বলিয়া মনে করি।

তৃতীয় সর্গে কমলা ও নীরজার কথোপকথন মেঘনাদ-বধ কাব্যের চতুর্থ সর্গের সীতা-সরমাসংবাদের অনুরূপ। কমলা ও সীতা দুজনেই পূর্বজীবনের সুখের দিনগুলি বর্ণনা করিতেছে, বনবাসের সুখের স্মৃতি। তবে সীতার সুখের

১ "হিমালয়ে এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার শাখা অগ্নিসংযুক্ত হইলে দীপের ন্যায় জ্বলে, তথাকার লোকেরা উহা দীপের পরিবর্তে ব্যবহার করে।" ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়া হইবার নয়। বিহারীলালের হিমালয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল কিনা জানি না। কবিতা পড়িয়া, ছিল বলিয়া মনে হয় না।

দিন গত, কমলার অবস্থা সেরূপ নয় ; ভাবী আনন্দের জন্য মনে তাহার তরলতা আছে ; সেইজন্য তাহার বর্ণনা লিরিক-ধর্মী ; সীতার বর্ণনা গান নয়, কাহিনী। বনফুল লিখিবার আগে কবির মেঘনাদবধ কাব্যের সঙ্গে নিশ্চয় পরিচয় হইয়াছিল।

চতুর্থ সর্গে বিবাহ সম্বন্ধে কমলার অজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা পর্যন্ত অনুরূপ অবস্থায় কপালকুণ্ডলার ভাষার সহিত এক।

"বিবাহ কাহারে বলে জানি না তা আমি"
কহিল কমলা তবে বিপিন-কামিনী!
"কারে বলে পত্নী আর কারে বলে স্বামী,
কারে বলে ভালবাসা আজিও শিখিনি।"

আবার নীরদ কর্তৃক কমলাকে প্রত্যাখ্যানের ভাষায় ও ভাবে প্রতাপ কর্তৃক শৈবলিনীকে প্রত্যাখ্যানের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

তবে যা লো দুশ্চারিণি। যেথা ইচ্ছা তোর
কর তাই যাহা তোর কহিবে হৃদয়
কিন্তু যতদিন দেহে প্রাণ রবে মোর
তোর এ প্রণয়ে আমি দিব না প্রশ্রয়॥
আর তুই পাইবি না দেখিতে আমারে—
জ্বলিব য'দিন আমি জীবন-অনলে—
স্বরঙ্গে বাসিব ভাল যা খুশি যাহারে—
প্রণয়ে সেথায় যদি পাপ নাহি বলে।

ভাষার বাহ্য মিলের কথা ছাড়িয়া দিলেও, কমলা-চরিত্র এবং কপালকুণ্ডলা-চরিত্রের কল্পনায় যেন মিল

আছে। বনবাসিনী সংসার-অনভিজ্ঞা সরলা বালিকাকে সংসারে আনিয়া ফেলিলে সে কি রকম ব্যবহার করে, তাহার বনবাসের সংস্কার ও সংসারের শিক্ষার মধ্যে. কাহার জয় হয়— ইহা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা বোধ করি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই ছিল। কপালকুণ্ডলা ও কমলার পরিণাম অনুরূপ। সংসারের সঙ্গে খাপ খায় নাই বলিয়া দুইজনেরই জীবন ট্রাজিক। এই পরীক্ষার ইচ্ছা হইতেই এই দুটি চরিত্রের কল্পনা। মৌলিক কল্পনার বিচারেও রবীন্দ্রনাথ বোধ করি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ঋণী।

আবার, নীরদ-চরিত্র প্রতাপ-চরিত্রের ছাঁচে ফেলিয়া গঠিত বলিয়া মনে হয়। নীরদ কমলাকে ভালোবাসে কিন্তু সে অপরের পত্নী বলিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল, কিন্তু মনে সেজন্য বেদনার তার অন্ত নাই। প্রতাপ-শৈবলিনীর মধ্যেও কি ঠিক এই সম্বন্ধ নয়?

প্রসঙ্গত, এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রনাথের ঋণ সম্বন্ধে বলা যায় যে, কবির 'বৌঠাকুরানীর হাট' 'রাজর্ষি' বঙ্কিমী উপন্যাসের ধারায় গঠিত; যেন রবীন্দ্র-বস্তু বঙ্কিমী-ছাঁচে ঢালাই করা হইয়াছে। বৌঠাকুরানীর হাটের রুক্মিণী বিষ-বৃক্ষের হীরা মালিনী ছাড়া আর কেহ নয়।' তবে হীরা ও রুক্মিণীতে যেটুকু প্রভেদ তাহা মানবচরিত্রের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও পরোক্ষ জ্ঞানের প্রভেদমাত্র। এরকম বাসনার জ্বালাময় চরিত্র সৃষ্টির পন্থা রবীন্দ্রনাথ আর অনুসরণ করেন নাই। ইহা তাঁহার নিজ শক্তিপরীক্ষার যুগের একটা চেষ্টা বা সৃষ্টি।

ষষ্ঠ সর্গে একটা 'য়ুটোপিয়া' বা আদর্শ জগতের কাল্পনিক

চিত্র আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কাব্যে একটা করিয়া আদর্শ জগৎ বা আদর্শ যুগের চিত্র আছে। পরবর্তী কাব্যে এরকম জগদতিরিক্ত জগতের সৃষ্টি তিনি আর করেন নাই, কারণ জগতের মধ্যেই আদর্শ জগতের উপলব্ধির চেষ্টা তাঁহার ছিল। কেবল নৈরাশ্যবাদীই বাস্তব-অতিক্রম-কারী আদর্শ জগতের কল্পনা করে, কিন্তু আশাবাদী বাস্তবকে একেবারে নাকচ করিয়া দিয়া 'বৃন্তহীন' আদর্শ গঠনের কল্পনায় কখনো শান্তি পায় না।

বন-ফুলের এই আদর্শ জগতের কল্পনায় কালিদাস ও শেলির আদর্শ জগতের কল্পনা যেন মিশিয়াছে। কালিদাসের য়ূটোপিয়া বা আদর্শ জগৎ উত্তরমেঘের অলকা। শেলির আদর্শ জগতের কল্পনা তাঁহার অধিকাংশ কাব্যে আছে। কালিদাসের অলকা, ও শেলির এপিসাইকিডিয়নের সমুদ্রপারের সেই দ্বীপ যাহা "Beautiful as a wreck of Paradise," "ভূতলের স্বর্গখণ্ড" মিশিয়া বন-ফুলের আদর্শ জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। আগেই বলিয়াছি পরিণত বয়সে "ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি"র জন্য রবীন্দ্রনাথকে কোনো কাল্পনিক জগতে বা যুগে যাইতে হয় নাই। চৌদ্দ বৎসরের বালকের মেঘদূত বা এপিসাইকিডিয়নের সঙ্গে পরিচয় ছিল কি না বলিতে পারি না—যতক্ষণ তথ্যের দ্বারা তাহা প্রমাণ করা না যাইতেছে ততক্ষণ ইহা অনুমানমাত্র থাকিয়া যাইবে।

সপ্তম সর্গে একটি শ্মশানের বর্ণনা আছে। হেমচন্দ্রের ছায়াময়ীর শ্মশানবর্ণনাও অনুরূপ। তবে একটির উপরে অন্যটির প্রভাব আছে এমন জোর করিয়া বলা যায় না,

কারণ যদিচ ছায়াময়ীর প্রকাশকাল ১৫ই জানুয়ারি ১৮৮০ এবং বন-ফুলের প্রকাশকাল ৯ই মার্চ ১৮৮০; তবু বন-ফুল ইতি-পূর্বেই (১২৮২-৮৩ সালে) মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; তবে পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় কোনোরূপ পরিবর্তিত হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। তৎসত্ত্বেও একথা উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সের রচনায় অনেক স্থলে হেমচন্দ্রের প্রভাব আছে। বিহারীলালকে ছাড়িয়া দিলে অন্য কোনো বাঙালী কবির এত প্রভাব তাঁহার কাব্যে নাই। অষ্টম বা শেষ সর্গে আবার হিমালয়ের একটি বর্ণনা আছে। এই বর্ণনাতেও বিহারীলালের হিমালয়-বর্ণনার প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ; বিশেষ, তুই কবির বর্ণনাতেই শ্লোকগঠনরীতি একই রকমের, ইহাও প্রভাবসঞ্জাত বটে।

মনে রাখিতে হইবে বন-ফুল চৌদ্দ বছরের বালকের রচনা। সে-বিচারে ইহাতে অপরিণত চিন্তার শিথিলতা, বাস্তববোধের অভাব, রচনার অপারিপাট্য ছাড়া আর কি আশা করা যায়? আবার মনে রাখিতে হইবে যে, এই চৌদ্দ বছরের বালক উত্তরকালে পৃথিবীর অন্যতম মহাকবি হইয়াছিলেন; সে-বিচারে ইহার মধ্যে ভাবী প্রতিভার বিদ্যুৎ-চমক ক্ষণে ক্ষণে পাঠককে চমকিত করিয়া দেয়; মেঘান্তরাল-নিহিত বজ্রের সংকেতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রফলক, শব্দবিন্যাস পাঠককে চকিত করিয়া দিয়া যায়; বর্ণনার আড়ম্বরে জীমূত-মন্দ্র ধ্বনিত হইয়া উঠে। কবির ভবিষ্যৎকে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই বুঝিতে পারি, ওসব ভারতব্যাপী কাব্যের মহাবর্ষণের পূর্বাভাস ছাড়া আর কিছু নয়। বালক-কবির

ভবিষ্যৎকে স্মরণ করিয়া তবে এই কাব্যের বিচার করিতে হইবে।

এই কাব্যের ষষ্ঠ সর্গের আদর্শ জগতের বর্ণনা, সপ্তম সর্গের শ্মশানবর্ণনা, অষ্টম সর্গের হিমালয়শৃঙ্গে কমলার মৃত্যুর বর্ণনা যথেষ্ট অপরিণত, তৎসত্ত্বেও কবির চয়নিকায় স্থান পাইলে কবির পক্ষে অবিচার হইবার আশঙ্কা আছে বলিয়া মনে হয় না।

কবি-কাহিনী

বন-ফুল কাব্যের মাত্র দুই বৎসর পরে কবি-কাহিনী কাব্য রচিত। কিন্তু এই দুই বৎসরেই কবির মনের ও শিল্পের অনেকটা পরিণতি হইয়াছে। গঠনরীতিতে কবি-কাহিনী পূর্ববর্তী কাব্যের চেয়ে অনেকটা সরল, অনেকটা সুপিনদ্ধ। বন-ফুলের যথেচ্ছ শিথিলতা ইহাতে অনেক পরিমাণে সংযত। কিন্তু ইহার চেয়েও গুরুতর পরিবর্তন কাব্যের ভাব বস্তুতে ঘটিয়াছে। বন-ফুলের নায়ক কমলা; নীরদ গৌণ-নায়ক; এই নীরদ কবি। কোনো কবি-বৈশিষ্ট্য তাহার চরিত্রে দেখানো হয় নাই; লেখকের কথার উপরে বিশ্বাস করিয়া তাহাকে কবি বলিয়া ধরিয়া লওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। কবি-কাহিনীতে এই কবি অন্য দেহে কাব্যের নায়কত্ব লাভ করিয়াছে। তাহার কবিত্বগুণের জন্য লেখকের কথা-মাত্রের উপরে আর বিশ্বাস রাখিবার প্রয়োজন নাই। তাহার চিন্তাপ্রণালী, আচারব্যবহার, তাহার প্রকৃতি-প্রীতি ও মানব-জীবনে ঔৎসুক্য, এবং সর্বোপরি তাহার কবিজনোচিত মহৎ অতৃপ্তি— সমস্তই স্পষ্ট বলিয়া দেয় লোকটা কবি। এই কবিকে কাব্যের নায়ক করিয়া তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে লেখক নিজেকে কাব্যের নায়ক করিয়া ফেলিয়াছেন। কবি-কাহিনী লেখকের অন্তর্জীবনের আত্মকাহিনী। সারা জীবন ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ যে আত্মকাহিনী লিখিয়া চলিয়াছেন কবি-কাহিনী তাহার প্রথম ধাপ। সেইজন্য প্রকৃতপক্ষে এই কাব্যকেই প্রথম রবীন্দ্র-কাব্য বলা উচিত। বন-ফুলেও নিজের অগোচরে

আত্মজীবনীর প্রথম ধাপে আসিয়া দাঁড়াইবার আকুতি তাহার ছিল, কিন্তু কমলাকে নায়িকা করিয়া কবিকে গৌণ করিয়া ফেলাতে সে সুযোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আবার, কমলার উপরে কপালকুণ্ডলার প্রভাব আসিয়া পড়িয়া স্রোতটাকে কবির অনভীষ্ট দিকে লইয়া গিয়াছে। কবি-কাহিনীতে বাহিরের অবান্তর প্রভাব ঘটনাস্রোতকে তির্যকগতি দান করিতে পারে নাই।

এই কবি প্রথমবারের জন্য তাঁহার কাব্যে দেখা দিল, কিন্তু এখানেই তাহার শেষ নয়। রবীন্দ্রনাথের পরিণততম বয়সের কাব্যে ও নাট্যে এই কবি বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। অবশ্য জীবনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে কবিরও পরিণতি ঘটিয়াছে। শেষজীবনের কাব্যে ও নাট্যে কবি ব্যক্তিত্বহীন এক ব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কোনোখানে সে আদর্শ দর্শক, কোনোখানে বা সে জীবনরহস্যের আদর্শ ব্যাখ্যাকারী। কিন্তু প্রথমদিকের কাব্যাদিতে সে এরকম ব্যক্তিত্ববর্জিত নির্গুণ ব্যক্তিমাত্র নয়। শেষের দিকের কবি সাধারণ মানুষের মতো সুখদুঃখের দ্বারা বিচলিত নয়, সম্পূর্ণ আত্মস্থ ; সে যেন দেহ-গুণবর্জিত শরীরী মানসমাত্র। প্রথমদিকের কবি সাধারণ মানুষ, তাহার ব্যক্তিত্ব আছে, সে সুখদুঃখ-জরামৃত্যুর অধীন। রবীন্দ্রনাথের এই কবি-ব্যক্তিটি কিভাবে পরিবর্তনের মধ্য দিয়া পরিণতির দিকে চলিয়াছে সে কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হওয়া দরকার— তাহার ফলে রবীন্দ্র-কাব্যের অনেক রহস্য প্রকাশিত হইতে পারে। বর্তমান প্রসঙ্গ তাহার উপযুক্ত স্থান নয় বলিয়া ইঙ্গিতমাত্র করিয়া নিবৃত্ত হইতে হইল।

বন-ফুল প্রসঙ্গে আমরা ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের কথা

বলিয়াছি যে, তাঁহারা সকলেই দীর্ঘ কাহিনী-কাব্য জীবনের প্রারম্ভে লিখিয়াছিলেন। এই কাহিনী-কাব্যের একটিমাত্র বিষয়বস্তু ; কবির মানস-জীবনের কাহিনী। বস্তুত ওয়াডসওয়ার্থ শেলি কীট্‌সের কাহিনী-কাব্যগুলির নাম দেওয়া যাইতে পারে কবি-কাহিনী। ওয়াডসওয়ার্থ ও কীট্‌সের মনের পরিণতি ও পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ওয়াডসওয়ার্থ পরিণত বয়সে কবি-কাহিনীর মোহ কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের ছায়াই তাঁহার কাব্যজগতের একমাত্র অধিবাসী আর ছিল না। কীট্‌সও স্বল্পপরিসর জীবনে নিজের ছায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু শেলির কোনোদিনই এই ছায়ার মোহ কাটে নাই। শেলি যেন সহস্রদীপালোকিত কক্ষের অধিবাসী, নিজের সহস্র ছায়ার জনতাকে তিনি বাস্তব মানুষের জগৎ বলিয়া মনে করিতেন। কাজেই তিনি যখন বাস্তব জগৎকে অঙ্কিত করিতেছেন, বাস্তব মানুষকে চিত্রিত করিতেছেন, তখন নিজেরই ব্যক্তিত্বকে অঙ্কিত করিতেছেন মাত্র। শেলির সব কাব্যই কবি-কাহিনী বা শেলি-কাহিনী।

শেলির প্রথম কাব্য Queen Mab কুঈন ম্যাব-এর নায়ক কবি নয়, একটি মেয়ে। রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রথম কাব্য বন-ফুলে কবিকে নায়ক না করিয়া কমলাকে নায়ক করিয়া ভুল করিয়াছিলেন ; শেলিও ঠিক সেই ভুল করিয়াছেন, কুঈন ম্যাব কাব্যে। দ্বিতীয় কাব্যে শেলি ও রবীন্দ্রনাথ কবিকে মুখ্য করিয়া তুলিয়া নিজেদের অগোচরে অভীপ্সিত কবি-কাহিনী বা আত্মকাহিনীর পথের মোড়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। শেলির Alastor অ্যালাস্টর ও রবীন্দ্রনাথের কবি-কাহিনী, এই কাব্যদ্বয় পড়িয়া

আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, কবি-কাহিনী লিখিবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের অ্যালাস্টর-এর দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পথনির্দেশ পাইয়াছিলেন। তাঁহার যে সেই বয়সে অ্যালাস্টর-এর সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল এমন বাহ্য প্রমাণ আমার হাতে নাই, কিন্তু অন্তঃপ্রমাণ এমনই অকাট্য যে বাহ্য প্রমাণের কোনো প্রয়োজনও নাই। এইরূপ আলোচনার পূর্বে কবি-কাহিনীর কাহিনী, অংশ ও তাহার বিশ্লেষণ জানা আবশ্যক।

বন-ফুল বা ভগ্নহৃদয়ের তুলনায় কবি-কাহিনী ক্ষুদ্রকায় কাব্য। অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই কাব্য রচিত।

প্রথম সর্গে কবির প্রকৃতি বন্দনা ও অবশেষে প্রকৃতিতে অতৃপ্ত হইয়া কবির মানুষের সন্ধান। দ্বিতীয় সর্গে নলিনীর সঙ্গে মিলন, কিন্তু তাহাতে পূর্ণ তৃপ্তি না পাইয়া মহাপ্রণয়ের সন্ধানে কবি বিশ্বভ্রমণে বাহির হইল। তৃতীয় সর্গে বৃহত্তর প্রকৃতিতেও কবির শান্তি মিলিল না। সে ফিরিয়া আসিল। ইতিমধ্যে মনঃকষ্টে নলিনীর মৃত্যু হইয়াছে। হিমালয়ের তুষারে তাহাকে সমাহিত করিয়া কবির প্রস্থান। চতুর্থ সর্গে প্রকৃতির মধ্যেই কবি যেন অশরীরী নলিনীকে প্রত্যক্ষ করিল। এবারে প্রকৃতি পূর্ণ হইয়া উঠিয়া কবিকে শান্তি দিতে সক্ষম হইল। ক্রমে কবির যৌবন গেল, বার্ধক্য আসিল। অবশেষে হিমালয়ে বাস করিতে করিতে হিমালয়ের কোলেই তাহার মৃত্যু হইল।

বন-ফুলের মতই এই কাব্যেও গল্পাংশ অতি সামান্য। কিন্তু গঠনরীতিতে অধিকতর কৌশল থাকায় পাঠকের পক্ষে

শেলির অ্যালাস্টর রবীন্দ্রনাথের প্রিয় কবিতা ছিল, একথা উল্লেখযোগ্য।

তাহা দুর্বিষহ হইয়া ওঠে নাই, বিশেষ কবির মহৎ অতৃপ্তি সমস্ত কাব্যখানিকে এমন জ্বালার জ্যোতির্মণ্ডলীতে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে যে গল্পাংশের তুচ্ছতা চোখে পড়িবার আগেই পাঠক কাব্যের শেষ পাতায় আসিয়া উপস্থিত হয়।

কবি-কাহিনীর মর্মার্থ সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যেরই মর্মার্থ। এক কবি ছিল, সে প্রকৃতির কোলেই জন্মিয়াছিল; সেখানেই বেশ শান্তিতে সে দিনপাত করিতেছিল। একদিন সে হঠাৎ আবিষ্কার করিল যে প্রকৃতি মানুষকে শান্তি দিতে পারে না, মানুষের মন মানুষের মনের সঙ্গে মিলিত হইতে চায়। তখন সে ভ্রমণে বাহির হইয়া নলিনী নামে একটি বালিকার দেখা পাইল। সে বালিকাও একা থাকিত, কাজেই সেও কবিকে পাইয়া জীবন সার্থক অনুভব করিল।

কিছুকাল দুজনে একসঙ্গে থাকিবার পরে কবি আবার অনুভব করিল, নলিনীর প্রেমেও তাহার যেন পূর্ণ তৃপ্তি হইতেছে না। তখন কবি বিশ্বভ্রমণে বাহির হইল। সারা বিশ্ব ঘুরিয়া কবি দেখিল, বৃহত্তর প্রকৃতিও তাহাকে আনন্দ দিতে সক্ষম নয়, তখন সে আবার নলিনীর কাছে ফিরিয়া আসিল। ইতিমধ্যে নলিনী মনের দুঃখে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কবি তখন হিমালয়ে গিয়া জীবন অতিবাহিত করিল; প্রকৃতির মধ্যে নলিনীর সত্তাকে অনুভব করাতে প্রকৃতি এবার সত্য সত্যই সজীব হইয়া উঠিল। আর হিমালয়ও যেন শুধু হিমালয় নয়— মানব-ইতিহাসের প্রধান সাক্ষী এবং মানুষের ভবিষ্যতের প্রধান দর্শকরূপে তাহার এক নূতন মূর্তি কবি দর্শন করিল। অবশেষে এখানেই বৃদ্ধ কবির মৃত্যু হইল।

কাব্যখানির তিনটি অংশ। প্রথম অংশে মানববর্জিত

প্রকৃতি ; দ্বিতীয় অংশে মানব নলিনী ; তৃতীয় অংশে মানুষের সত্তায় সজীবতর, সমৃদ্ধতর প্রকৃতি।

সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যেরও কি এই তিন ভাগ নয় ? তাঁহার প্রথমবয়সের কাব্যের প্রধান নায়ক প্রকৃতি, মধ্যজীবনের কাব্যের প্রধান নায়ক মানুষ ; শেষবয়সের কাব্যের প্রধান নায়ক নিছক মানুষও নয়, নিছক প্রকৃতিও নয় ; মানুষ ও প্রকৃতির একটি মহত্তর অপূর্ব সমন্বয়। প্রথম ও শেষ বয়সের কাব্যের সীমানা কোথায় টানা হইবে সে-বিষয়ে মতভেদ ঘটিতে পারে। সন্ধ্যাসংগীত ও গীতাঞ্জলিতে দুই দাঁড়ি টানা যাইতে পারে ; আবার মানসী ও বলাকাতে টানিলেও হয়তো ভুল হইবে না ; অথবা কোনো একখানি বিশেষ কাব্যে বা বিশেষ তারিখে রেখা টানা চলে না, কারণ এসব পরিবর্তন ধীরে ধীরে দীর্ঘকাল ধরিয়া হইতে থাকে। মোটকথা, একদিন তাঁহাকে 'হৃদয়-অরণ্য' হইতে নলিনী বা মানুষের সন্ধানে বাহির হইতে হইয়াছিল এবং মানুষকে পাইয়া কবি-কাহিনীর কবির মতই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, নিছক মানুষে কবির মহৎ অতৃপ্তি মিটিবার নয়। একদিকে তাঁহাকে প্রকৃতি টানিয়াছে, একদিকে মানুষে টানিয়াছে ; দুয়ের টানাটানিতে তাঁহার কাব্যে একটা চঞ্চলতা, কেমন যেন একটা অশান্তি বরাবর রহিয়া গিয়াছে। শেষজীবনের কাব্যে খানিকটা শান্তি যেন লক্ষিত হয় ; সেই পরিমাণে শান্তি, যে-পরিমাণে এই দুই বিপরীত সত্তার সমন্বয় তাঁহার চিত্তে ঘটিয়াছে। কিন্তু বরাবর এই দুটি ধারাই তাঁহার কাব্যে আছে। 'সোনার তরী' কাব্যের "সোনার তরী" ও "নিরুদ্দেশ যাত্রার" তুলনা করিলে এই বিপরীতমুখী আকর্ষণ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সোনার তরীর নাবিক মানব সংসারমুখী ;

যুগে যুগে সোনার ফসল লইয়া যে মানুষের দেশে দেশে, ইতিহাসের ঘাটে ঘাটে পাড়ি জমাইতেছে। আর নিরুদ্দেশ যাত্রার নাবিকা সোনার ফসলের অপেক্ষা রাখে না, স্বয়ং কবিকে তুলিয়া লইয়া নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকের দিকে পাড়ি দেয়।

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের কাব্যের সীমানা 'বলাকা'। এই সীমানার দুই দিকের ঢালু ছাদের দুই রকম মূর্তি। একদিকে আছে "দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন ওরে উদাসীন"; আছে "পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি ওই কেটে গেল ওরে যাত্রী"; আছে "মত্ত সাগর পাড়ি দিল গহন রাত্রিকালে ঐ যে আমার নেয়ে" প্রভৃতি নলিনী বা মানুষের কবিতা— কবি-কাহিনীর নলিনী মানুষের প্রতীক। আবার আর-একদিকে আছে "পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে"; আছে "কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে"; আছে "ওরে তোদের ত্বর সহে না আর?" আছে "যে-বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল" প্রভৃতি প্রকৃতির কথা।

আর এই সীমান্তপর্বতের জ্যোতির্ময় শৃঙ্গচূড়ায় প্রকৃতি, ও নলিনী বা মানুষ মিলিয়া এক অভিনব সত্তার সৃষ্টি করিয়াছে।

যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ আভাসে,
ক্লান্তসন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্যবিলাসে, ..

আবার—

তোমার চিকন
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত
মর্ম্মরমুখর ছায়া মাধবীবনের
হ'ত স্বপনের।...
নয়ন-সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।

এই সত্তা নলিনীর? না প্রকৃতির? নলিনী ও প্রকৃতি এখানে মিলিয়া মিশিয়া গিয়া অর্ধনারীশ্বরের সৃষ্টি করিয়াছে।

এই অর্ধনারীশ্বরমূর্তির প্রথম আভাস কি কবি-কাহিনীতে নাই? নলিনীর মৃত্যুতে কবি বলিতেছে—

দেহ-কারাগার মুক্ত সে নলিনী এবে
সুখে দুখে চিরকাল সম্পদে বিপদে,
আমারিই সাথে সাথে করিছে ভ্রমণ।
চিরহাস্যময় তার প্রেমদৃষ্টি মেলি,
আমারি মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া।
রক্ষক দেবতা সম আমারি উপরে
প্রশান্ত প্রেমের ছায়া রেখেছে বিছায়ে।

কবি-কাহিনীর এই অপরিণত সমন্বয়ের পূর্ণতা বলাকায় এবং উত্তর-বলাকা পর্বে। উত্তর-বলাকা পর্বের প্রধান সম্পদ

গান; গানই যেন রবীন্দ্রনাথের ভাবের প্রধান বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার প্রথমজীবনের ও শেষজীবনের গানের তুলনা করিলে বোধ হয় আমাদের বক্তব্য আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

প্রথম দিকের কয়েকটি গানের অংশবিশেষ তুলিয়া দিতেছি, ইহা স্পষ্টত প্রকৃতির গান; মানুষ ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র হইয়া আছে, এ যেন দূর হইতে প্রকৃতিকে দর্শন।

অধীর যমুনা তরঙ্গ-আকুলা অকূলাবে।
তিমির-দুকূলাবে।
নিবিড় নীরদ গগনে, গর গর গরজে সঘনে
চঞ্চল চপলা চমকে নাহি শশী-তারা॥

অথবা—

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে।

অথবা—

ঐ বুঝি বাঁশি বাজে,
বন-মাঝে কি মন-মাঝে
বল গো সজনী, এ সুখ-রজনী
কোন্‌খানে উদিয়াছে
বন-মাঝে কি মন-মাঝে॥

বন-মাঝে কি মন-মাঝে? ইহা সমন্বয় নয়। সুখ-রজনী একসঙ্গে যখন বন-মাঝে ও মন-মাঝে উদিত হইবে, তখন আর প্রশ্ন করিবার কথাই মনে আসিবে না।

এবার উত্তর-বলাকা পবের গানের কয়েকটি অংশ উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

শরৎ-আলোর বাদল মেঘে
এই কথাটি বইবে লেগে
এই শ্যামলে এই নীলিমায় আমায় দেখা দিয়েছিলে।

অথবা—

দূরে পশ্চিমে ঐ দিনের পারে
অস্ত রবির পথের ধারে
রক্ত-রাগের ঘোমটা মাথায় পরলি রে কে তুই।

অথবা—

কোন্ ভোলা-দিনের বিরহিণী
যেন তারে চিনি চিনি
ঘন বনের কোণে কোণে
ফেরে ছায়ার ঘোমটা-পরা।

কিম্বা—

এ কথা কভু আর পারে না ঘুচিতে
আছে সে নিখিলের মাধুরী রুচিতে…
শরতে ক্ষীণ মেঘে ভাসিবে আকাশে
স্মরণ-বেদনার বরনে আঁকা সে।

এই সব গানের বিষয়বস্তু কি? মানুষ না প্রকৃতি? এই সব অপার্থিব সংগীতে যে বিদ্যুৎপর্ণা নৃত্য করিয়া চলিয়াছে, একমুহূর্তে তাহাকে মানুষ বলিয়া মনে হয়, পরমুহূর্তেই বুঝিতে পারা যায়, ভুল, সে প্রকৃতি। গানের এক ছত্রে পা ফেলিয়া বুঝিতে পারি প্রকৃতির রাজ্য, অপর ছত্রে পা ফেলিতেই বুঝিতে পারি কখন অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া মানুষের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি— এসব গান যেন প্রকৃতি ও মানবের দ্বৈতশাসনের রাজত্ব। ইহা প্রকৃতিকে মানবায়িত করাও নয়, মানুষকে প্রাকৃতিক করাও নয়, ইহা প্রকৃতি ও মানুষের এক অপূর্ব সমন্বয়; ভাষায় শব্দের অভাব বলিয়া ইহাকে মানব ও প্রকৃতির অর্ধনারীশ্বরমূর্তি বলিয়া উল্লেখ করিলাম। ইহা উভয়ের পরিপূর্ণ সমন্বয়— এই সমন্বয়ের সমুদ্রসংগমে রবীন্দ্র-

কাব্য ও শিল্পের সম্মিলন। ইহার সূচনা অপরিণত ভাবে, স্থূল ভাবে এবং কবির অজ্ঞাতসারে আরম্ভ হইয়াছে কবি-কাহিনী কাব্যে।

কবি-কাহিনীর সঙ্গে তুলনা করিয়া পড়িবার সুবিধার জন্য 'অ্যালাস্টর'-এর একটা বিশ্লেষণ দেওয়া গেল।

এক কবি ছিল, তরুণ বয়সেই যাহার মৃত্যু হইয়াছিল। এই কবির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিবার জন্য শেলি 'অ্যালাস্টব'-এর ভূমিকায় বলিয়াছেন কাব্যটি 'অ্যালিগরি' বা রূপকমাত্র ।

এই কবি প্রকৃতির কোলে মানুষ হইলেও প্রকৃতি তাহাকে তৃপ্তি দান করিতে সমর্থ হইল না। তখন সে নিজের মানস-সুন্দরীর সন্ধানে বাহির হইয়া পৃথিবীর সংকীর্ণ ইতিহাসের দেশে গিয়া উপস্থিত হইল।

একটি আরব-বালিকা সঙ্গীহীন কবিকে সঙ্গদান করিত, আহার্য জোগাইত, কিন্তু কোনোদিন সে মুখ ফুটিয়া নিজের ভালোবাসার কথা কবিকে বলিতে সাহস করে নাই, কেমন যেন তাহাকে ভয় করিত। সারারাত্রি কবির শিয়রে জাগিয়া থাকিয়া সে ভোরবেলা নিজের তাঁবুতে ফিরিয়া যাইত। কিন্তু এই প্রেম-ভীরু বালিকা তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিল না – কবি পুনরায় বিশ্বভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িল। নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে সে কাশ্মীরের উপত্যকায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে সে স্বপ্ন দেখিল যে একজন 'অবগুণ্ঠনবতী' (a veiled maid) তাহার পাশে বসিয়া কি যেন বলিতেছে। এই অবগুণ্ঠনবতীই 'অ্যালাস্টর'-এর ভূমিকায় কথিত

'the Being whom he loves', তাহার মানসসুন্দরী। এই অবগুণ্ঠনবতীর সন্ধানে কবি পুনরায় বাহির হইল। ইহার পর হইতে 'অ্যালাস্টর'-এর আখ্যান ও কবি দুই-ই ভূগোলবৃত্তান্ত-হীন এক কুহেলিকার রাজ্যে যেন বিলীন হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে দূর হইতে কবির অশরীরী আকৃতি মাত্র দেখা যায়— তাহার গতিবিধি প্রায় অনুমানের অগম্য। অতঃপর কাহিনীকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা বৃথা, কারণ কাহিনী বলিতে যাহা বোঝায় তাহা আর নাই। অবশেষে এক নিভৃত বনের প্রান্তে সঙ্গহীন ভগ্নহৃদয় কবির অকালে মৃত্যু হইল। তাহার সমাধির উপরে প্রকৃতি নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিত, বাতাস নিঃশ্বাস ফেলিয়া যাইত, মানুষ সেখানে কোনোদিন যায় নাই।

এবারে কবি-কাহিনীর বিস্তারিত বিশ্লেষণ দিলে কাব্য দুটির যোগাযোগ বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে।

শুন কলপনাবালা, ছিল কোন কবি
বিজন কুটীর-তলে। ছেলেবেলা হতে
তোমার অমৃত-পানে আছিল মজিয়া।

তার পরে—

যৌবনে যখনি কবি করিল প্রবেশ,
প্রকৃতির গীতধ্বনি পাইল শুনিতে,
বুঝিল সে প্রকৃতির নীরব কবিতা।

কবি ভাবিয়াছিল প্রকৃতির প্রণয়ে শান্তিলাভ করিবে।

হে জননি আমার এ হৃদয়ের মাঝে
অনন্ত-অতৃপ্তি-তৃষ্ণা জ্বলিছে সদাই,
তাই দেবি পৃথিবীর পরিমিত কিছু
পারে না গো জুড়াইতে হৃদয় আমার,
তাই ভাবিয়াছি আমি হে মহাপ্রকৃতি,

মজিয়া তোমার সাথে অনন্ত প্রণয়ে
জুড়াইব হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা।

কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই কবি বুঝিতে পারিল যে তাহার হৃদয়ের শূন্যতা পূর্ণ হইতেছে না, কিসের যেন অতৃপ্তি রহিয়া যাইতেছে। তখন সে বুঝিতে পারিল "মানুষের মন চায় মানুষেরি মন" কিন্তু তেমন মনের মতো মানুষ কোথায়? তাহার সন্ধানে তো কবি অনেক ঘুরিয়াছে। কবি যখন অতৃপ্তির গানে কানন ধ্বনিত করিয়া ফিরিতেছে তখন একটি বালিকা আসিয়া তাহার হৃদয়ের শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া দিল—তাহার নাম নলিনী। কবি কিছুদিনের জন্য শান্তি পাইল। কিন্তু তার পরেই আবার সেই অতৃপ্তি, কবিজনোচিত মহৎ অতৃপ্তি তাহার মনে দেখা দিল।

কবির সমুদ্র বুক পূরাতে পারিবে কিসে
প্রেম দিয়া ক্ষুদ্র ওই বনের বালিকা।
কাতর ক্রন্দনে আহা আজিও কাঁদিল কবি,
"এখনও পূরিল না প্রাণের শূন্যতা।"

নলিনীতে অতৃপ্ত কবি প্রাণের শূন্যতা দূর করিবার জন্য কবি বিশ্বভ্রমণে বাহির হইল। কাশ্মীরের বনে, রুশিয়ার হিমক্ষেত্রে, আফ্রিকার মরুভূমে তাহার ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা।

কবি নলিনীকে বলিতেছে—

এইখানে থাক তুমি, ফিরিয়া আসিয়া পুনঃ
ওই মধুমুখখানি করিব চুম্বন।

কবির বিরহে নলিনীর মৃত্যু হইল। এদিকে—

কত দেশ দেশান্তরে ভ্রমিল সে কবি
তুষার-স্তম্ভিত গিরি করিল লঙ্ঘন,...

কিন্তু বিহঙ্গের গান, নির্ঝরের ধ্বনি,
পারে না জুড়াতে আর কবির হৃদয়।
বিহগ, নির্ঝর-ধ্বনি, প্রকৃতির গীত,
মনের যে ভাগে তার প্রতিধ্বনি হয়,
সে মনের তন্ত্রী যেন হয়েছে বিকল।
একাকী যাহাই আগে দেখিত সে কবি,
তাহাই লাগিত তার কেমন সুন্দর,
এখন কবির সেই এ কি হল দশা,
যে প্রকৃতি-শোভা-মাঝে নলিনী না থাকে
ঠেকে তা শূন্যের মত কবির নয়নে,
নাইকো দেবতা যেন মনের মাঝারে।
বালার মুখের জ্যোতি করিত বর্ধন
প্রকৃতির রূপচ্ছটা দ্বিগুণ করিয়া;
সে না হলে অমাবস্যা নিশির মতন
সমস্ত জগৎ হত বিষণ্ণ আঁধার।

কবি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল ইতিমধ্যে নলিনীর মৃত্যু হইয়াছে। তখন কৃষ্ণবিরহিত পার্থের মতো নিজের সত্যকার শক্তি কোথায় সে বুঝিতে পারিল— বুঝিতে পারিল কত বড় ভুল সে করিয়াছে।

তখন কবি নলিনীকে তুষারে সমাহিত করিয়া সে বন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল— কোথায় গেল কেহ আর জানিতে পারিল না।

চতুর্থ বা শেষ সর্গে কোনো ঘটনা নাই বলিলেই চলে। কবি মনের দুঃখে হিমালয়ে চলিয়া গিয়াছে, সেখানে সে চিন্তা করিতে লাগিল নলিনীর সত্তা কি সত্যই চিরদিনের জন্য লোপ পাইয়াছে? তাহা হইলে কি সান্ত্বনায় কবি আর বাঁচিয়া

থাকিবে? দুঃখের অভিজ্ঞতায় কবি যেন বুঝিতে পারিল, মরিলেই সব ফুরায় না; মৃত্যুর পরে নলিনীর দেহহীন অস্তিত্ব প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে, এবং তাহাতে প্রকৃতি সমৃদ্ধতর প্রিয়তর হইয়া উঠিয়াছে।

দেহ কারাগার মুক্ত সে নলিনী এবে
সুখে দুখে চিরকাল সম্পদে বিপদে
আমারিই সাথে সাথে করিছে ভ্রমণ।

প্রকৃতি এমন সুন্দর, মাতার মতো যার প্রাণে অগাধ স্নেহ, তাহার রাজ্যে কি অমঙ্গল থাকিতে পারে? সান্ত্বনার অভাব থাকিতে পারে? নলিনীর লোপ সম্ভব হইতে পারে?

প্রকৃতি! মাতার মত সুপ্রসন্ন দৃষ্টি
যেমন দেখিয়াছিনু ছেলেবেলা আমি,
এখনো তেমনি যেন পেতেছি দেখিতে।
যা কিছু সুন্দর, দেবি, তাহাই মঙ্গল,
তোমার সুন্দর রাজ্যে হে প্রকৃতি দেবি,
তিল অমঙ্গল কভু পারে না ঘটিতে।
অমন সুন্দর আহা নলিনীর মন,
জীবন্ত সৌন্দর্য, দেবি, তোমার এ রাজ্যে
অনন্ত কালের তরে হবে না বিলীন।
যে আশা দিয়াছ হৃদে ফলিবে তা দেবি,
এক দিন মিলিবেক হৃদয়ে হৃদয়।
তোমার আশ্বাসবাক্যে হে প্রকৃতি দেবি,
সংশয় কখনো আমি করি না স্বপনে।

নলিনীর সঙ্গে পুনর্মিলন যদি সম্ভব হয় তবে আর দুঃখ কিসের? অতএব

বাজাও রাখাল তব সরল বাঁশরী।
গাও গো মনের সাধে প্রমোদের গান।

এইরূপে হিমালয়ে বাস করিতে করিতে কবির বার্ধক্য উপস্থিত হইল।

সুগম্ভীর বৃদ্ধ কবি, স্কন্ধে আসি তার
পড়েছে ধবল জটা অযত্নে লুটায়ে।
মনে হত দেখিলে সে গম্ভীর মুখশ্রী,
হিমাদ্রি হতেও বুঝি সমুচ্চ মহান্।
নেত্র তাঁর বিকীরিত কি স্বর্গীয় জ্যোতি,
যেন তাঁর নয়নের শান্ত সে কিরণ
সমস্ত পৃথিবীময় শান্তি বরসিবে।
বিস্তীর্ণ হইয়া গেল কবির সে দৃষ্টি,
দৃষ্টির সম্মুখে তার, দিগন্তও যেন,
খুলিয়া দিত গো নিজ অভেদ্য দুয়ার।[১]

মনুষ্যজগতে যেমন এই বৃদ্ধ কবি, প্রকৃতির জগতে তেমনি হিমালয়; দুজনেই বয়ঃপ্রবীণ, শুভ্রশীর্ষ, বহুদর্শী, শান্ত এবং সমাহিত। কবি স্বভাবতই নিজেকে হিমালয়ের সগোত্র অনুভব করিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া মনের খেদ প্রকাশ করিতেছে। এ খেদ ব্যক্তিগত নয়, কারণ ব্যক্তিগত নিজের সান্ত্বনা কবি প্রকারান্তরে লাভ করিয়াছে — এ খেদ মানুষের দুঃখ স্মরণ করিয়া।

কত কোটি কোটি লোক, অন্ধকারাগারে
অধীনতা-শৃঙ্খলেতে আবদ্ধ হইয়া

১ রবীন্দ্রনাথের 'কবি' প্রাচীন বয়সে শান্ত মহিমায় দেহরক্ষা করিয়াছে। শেলির 'কবি'র মৃত্যু অকালে অকস্মাৎ। এই দুই কবির মৃত্যু শেলি ও রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অনুরূপ।

ভরিছে স্বর্গের কর্ণ কাতর ক্রন্দনে,
অবশেষে মন এত হয়েছে নিস্তেজ,
কলঙ্ক-শৃঙ্খল তার অলংকাররূপে
আলিঙ্গন ক'রে তাবে বেখেছে গলায়।
দাসত্বের পদধূলি অহংকার ক'রে
মাথায় বহন করে পর-প্রত্যাশীরা।
যে পদ মাথায় করে ঘৃণার আঘাত
সেই পদ ভক্তিভরে করে গো চুম্বন।
যে হস্ত ভ্রাতারে তার পরায় শৃঙ্খল,
সেই হস্ত পরশিলে স্বর্গ পায় করে।
স্বাধীন, সে অধীনের দলিবার তরে,
অধীন, সে স্বাধীনের পূজিবারে শুধু।
সবল, সে দুর্বলেরে পীড়িতে কেবল,
দুবল, বলের পদে আত্ম বিসর্জিতে।
স্বাধীনতা কারে বলে জানে যেই জন
কোথায় সে অসহায় অধীন জনের
কঠিন শৃঙ্খল রাশি দিবে গো ভাঙিয়া,
না, তার স্বাধীন হস্ত হয়েছে কেবল
অধীনের লৌহপাশ দৃঢ় কবিবারে।

হিমালয় তো ইহাই চিরকাল দেখিতেছে, তাহার মত এমন বহু-অভিজ্ঞ সাক্ষী আর কোথায়? কিন্তু ইহাই কি চিরকাল চলিবে? জগতে কি সত্যযুগের আবির্ভাব সম্ভব নয়? কবি সেই সত্যযুগের স্বপ্ন দেখিতেছে—

কবে দেব এ রজনী হবে অবসান?
স্নান করি প্রভাতের শিশির-সলিলে,
তরুণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী।

অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে দেব,
এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি।
নাইক দরিদ্র, ধনী, অধিপতি, প্রজা,
কেহ কারো কুটীরেতে করিলে গমন
মর্যাদার অপমান করিবে না মনে,
সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, কেহ কারো দাস।
নাই ভিন্ন জাতি আর নাই ভিন্ন ভাষা
নাই ভিন্ন দেশ, ভিন্ন আচার ব্যাভার।
সকলেই আপনার আপনার লয়ে
পরিশ্রম করিতেছে প্রফুল্ল অন্তরে।
কেহ কারো সুখে নাহি দেয় গো কণ্টক,
কেহ কারো দুখে নাহি করে উপহাস।
দ্বেষ নিন্দা ক্রূরতার জঘন্য আসন
ধর্ম-আবরণে নাহি করে গো সজ্জিত।
হিমাদ্রি, মানুষ সৃষ্টি আরম্ভ হইতে
অতীতের ইতিহাস পড়েছ সকলি,
অতীতের দীপশিখা যদি হিমালয়
ভবিষ্যৎ অন্ধকার পারে গো ভেদিতে,
তবে বল কবে গিরি, হবে সেই দিন
যেদিন স্বর্গই হবে পৃথ্বীর আদর্শ।

সেদিন যদিও আজ দূরে তবু কবি যেন তাহা কল্পনানেত্রে দেখিতে পাইতেছে, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস "একদিন তাহা আসিবে নিশ্চয়।"

এ সান্ত্বনা তাহাকে কে দিল? নলিনীর মৃত্যুশোকে যে সান্ত্বনা দিয়াছিল, এ ক্ষেত্রেও সেই প্রকৃতিই কবিকে আসন্ন সত্যযুগের আশ্বাস দিয়াছে।

আবার বলি গো আমি হে প্রকৃতিদেবি,
যে আশা দিয়াছ হৃদে ফলিবেক তাহা,
একদিন মিলিবেক হৃদয়ে হৃদয়।
এ যে সুখময় আশা দিয়াছ হৃদয়ে
ইহার সংগীত দেবি, শুনিতে শুনিতে
পারিব হরষ চিতে ত্যজিতে জীবন।

এমনি করিয়া প্রকৃতির মধ্যে সে কবির ব্যক্তিগত দুঃখ ও মানুষের সমষ্টিগত দুঃখ একই সান্ত্বনায় শান্তি লাভ করিল। নলিনীর মরণোত্তর অস্তিত্ব আর মানুষের সত্যযুগের সম্ভাবনা—এ দুয়েরই সান্ত্বনা প্রকৃতি দিয়াছে। একটা তো কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য, কাজেই অপরটা কি মিথ্যা হইতে পারে?

এইরূপে মানুষের দুঃখে অশ্রুপাত করিয়াও সত্যযুগের আশায় বুক বাঁধিয়া কবি হিমালয়ের শিখরে আছে—

বিশাল ধবল জটা বিশাল ধবল শ্মশ্রু,
নেত্রের স্বর্গীয় জ্যোতি গম্ভীর মুরতি,
প্রশস্ত ললাটদেশ, প্রশান্ত আকৃতি তার
মনে হত হিমাদ্রির অধিষ্ঠাতৃ দেব।

কবি আপন মনে যখন একাকী বসিয়া থাকিত তখন দূর হইতে "নলিনীর সুমধুর আহ্বানের গান" শুনিতে পাইত। এমনি ভাবে

একদিন হিমাদ্রির নিশীথ বায়ুতে
কবির অন্তিম শ্বাস গেল মিশাইয়া।
হিমাদ্রি হইল তার সমাধিমন্দির.
একটি মানুষ সেথা ফেলে নি নিশ্বাস।
প্রত্যহ প্রভাত শুধু শিশিরাশ্রুজলে
হরিত পল্লব তার করিত প্লাবিত।

শুধু সে বনের মাঝে বনের বাতাস,
হু হু করি মাঝে মাঝে ফেলিত নিশ্বাস।
সমাধি উপরে তার তরুলতাকুল
প্রতিদিন বরষিত কত শত ফুল।
কাছে বসি বিহগেরা গাইত গো গান,
তটিনী তাহার সাথে মিশাইত তান।

কবি-কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ শেলিকে অনুসরণ করিতেছিলেন, কিন্তু শেলির কাব্যের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় না ঘটিলেও তাঁহার কবিমনের বিবর্তন যে ভিন্ন হইত এমন মনে করিবার হেতু নাই, কারণ শেলি ও রবীন্দ্রনাথের মন বিধাতা একই ছাঁচে গড়িয়াছিলেন। এত কবি থাকিতে বিশেষ করিয়া তিনি যে শেলিকেই অনুসরণ করিতেছিলেন তাহার কারণ রবীন্দ্রনাথ শেলির কবিমনকে নিজের কবিমনের সগোত্র বলিয়া অবচেতনভাবে যেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অপর পক্ষে, এই দুই কবির মনের মিলটাই সত্যের সম্পূর্ণ রূপ নয়, অমিলও আছে। শেলির কবিজীবন অকালে সমাপ্তি লাভ করিয়াছিল বলিয়া তাঁহার মনের পরিণতি ঘটিতে পারে নাই, রবীন্দ্রনাথের জীবনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে কবিমনের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। দীর্ঘজীবন লাভ করিলে শেলির মন কোন্ পরিণতিতে পৌঁছিত জানি না— রবীন্দ্র-মনের অনুরূপ কোনো লক্ষ্যে হয়তো পৌঁছিত। কিন্তু ইহা নিষ্ফল জল্পনা মাত্র। আসল কথা এই যে, শেলির কবিমনের নভশ্চারী আদর্শবাদ শেষ পর্যন্ত বাস্তব প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই; বাস্তব সত্যের

ভিত্তি পায় নাই বলিয়া তাহার আদর্শবাদ ত্রিশঙ্কুর মতো কবির কল্পনার বায়ুলোকে নিরালম্বভাবে ঝুলিতেছে মাত্র। 'কুঈন ম্যাব' হইতে 'প্রমিথিয়ুস আন্‌বাউণ্ড'এ, 'অ্যালাস্টর' হইতে 'এপিসাইকিডিয়ন'-এ কবির শিল্পশক্তি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, অভিজ্ঞতার পূর্ণতার বিশেষ চিহ্ন নাই; 'অ্যাডোনাইস'-এ মানসিক পরিণতির সূত্রপাত দৃষ্ট হয়; কবির আদর্শলোকের 'এক' জাগতিক সত্যের 'বহু'র সঙ্গে মিলিত হইবার মুখে; এই এক ও বহুর সার্থক ও সুপ্রতিষ্ঠ মিলন-সাধনেই হয়তো শেলির কবিজীবন ধন্য হইত। সেইজন্যই শেলি ও রবীন্দ্রনাথের কবিমনের পরিণতি অনুরূপ হইত বলিয়াছি।

শেলির যে-বয়সে মৃত্যু হইয়াছিল প্রায় সেই বয়সে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নাট্যে দেখিতে পাওয়া যায় কবির মন কত পরিণতি লাভ করিয়াছে; কবি-কাহিনীর শূন্যচারী আদর্শবাদ হইতে বাস্তব সত্যের কত কাছে আসিয়া তিনি পৌঁছিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ পরিণততর বয়সের কাব্য আলোচনা করিলে এই পরিণামকে সম্পূর্ণতর আকারে দেখা যাইবে, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই এমন কাব্য লইয়াছি যাহা শেলির আয়ুর সীমার মধ্যে পড়ে।

চিত্রাঙ্গদা ও কবি-কাহিনীর গল্প ভিন্ন হইলেও ভাবের উপজীব্য ভিন্ন নয়। অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার প্রেম নলিনী ও কবির প্রেমের অনুরূপ। বনচারী কবি নলিনীকে লাভ করিল, বনচারী অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে লাভ করিল। কবি নলিনীর প্রেমে শেষ পর্যন্ত তৃপ্ত না হইয়া মহত্তর অনির্দিষ্টের সন্ধানে বাহির হইয়া গেল, ফিরিয়া যখন আসিল তখন সে মহত্তরকেও পায় নাই, নলিনীকেও হারাইল। অর্জুনও

চিত্রাঙ্গদার প্রেমোপভোগের পরে বৎসরান্তে বৃহত্তর সংসারের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, কবির মত অনির্দিষ্টের জন্য নয়। কবি নলিনীকে হারাইল; অর্জুন প্রণয়িনীর মধ্যে সন্তানের জননীকে পাইল, সম্ভবত সন্তানের মধ্যে মানুষকে পাইল, গৃহহীন আরণ্য প্রেমের বর্ষভোগ্য মোহ কাটিয়া গেলে অর্জুন পত্নীর মধ্যে বিবাহিত প্রেমকে লাভ করিল; এমনি ভাবে প্রেমের আদর্শবাদ গার্হস্থ্যজীবনের বাস্তব ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইল, দম্পতির প্রেম সন্তানেব মধ্য দিয়া মানব-সংসারের সহিত গ্রথিত হইয়া গেল। এই দুই কাব্যের আরম্ভ একই জায়গায়— নিছক আদর্শবাদে; কিন্তু চিত্রাঙ্গদাতে ইহা বাস্তবপ্রতিষ্ঠ, আর কবি-কাহিনীর শূন্যচারী আদর্শবাদ শূন্যেই রহিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যের রমণীরা রিয়ালিস্ট, তাহারা জানে অরণ্যের গৃহহীন প্রেম সংসারে লইয়া যাইবার নয়; সংসারে সে প্রেমকে লইয়া গেলে তাহাকে বিবাহের বাস্তব ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে হইবে; তাহাকে সন্তান-ধারার মধ্যে সার্থক করিতে হইবে। সেইজন্য চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের সঙ্গে যাইতে স্বীকার করে নাই; সন্তান জন্মলাভ করিলে তাহাকে পিতৃসমীপে পাঠাইয়া দিবে বলিয়াছে। নলিনী কবিকে মহত্তর মানসযাত্রার অনুমতি স্বেচ্ছায় দেয় নাই; অবচেতনভাবে সে জানিত, মহত্তরকে বাহিরে খুঁজিতে হয় না, জানিত, প্রেমের আঙিনার কোণেই মহত্তর অলৌকিক পারিজাত পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। বন-ফুলের কমলা রিয়ালিস্ট নয়, সে আদর্শবাদী; যদিও সে নারী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্যে 'কবি'র যাহা কাজ ও স্বভাব তাহাই যেন সে পাইয়াছে। প্রথমতম কাব্যে রবীন্দ্রনাথ

তাহাকে পুরুষ না করিয়া নারী করিয়া গড়িবার করিয়াছিলেন; পরবর্তী কাব্যে কমলাই কবি-রূপ ধারণ করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী'ও আলোচিত হইতে পারে। শেলির আয়ুঃসীমার অত্যল্পকাল পরে ইহা রচিত। ইহাতেও আদর্শবাদ বাস্তবনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে; 'গৃহের বনিতাই' 'বিশ্বের কবিতা'; মনে যাহা ভাবময়, গৃহে তাহা মূর্তিমতী; কল্পনা ও প্রেম, কবি ও মানুষ পরস্পর সন্নিধি লাভ করিয়াছে। শেলির পরিণত বয়সের 'এপিসাইকিডিয়ন'-এও বাস্তব ও কল্পনা মিলিবার দিকে এক পা-ও যেন অগ্রসর হয় নাই; 'অ্যালাস্টর'-এ যেখানে ছিল, সেখানেই আছে।[১]

শেলির কাব্যে দুটি ধারা আছে; একটি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অতৃপ্তি ও অশান্তি, অপরটি বৃহত্তর মানবসমাজের দুঃখ ও অশান্তি; একটির প্রকাশ 'হিম্ টু ইণ্টেলেক্চুয়্যাল বিউটি'-তে, অপরটির প্রকাশ 'ওড্ টু দি ওয়েস্ট উইণ্ড'-এ, একটিতে শেলি আত্মকেন্দ্রী কবি, অপরটিতে তিনি কেন্দ্রাতিগ মানবসমাজের সত্যযুগের 'প্রফেট'। তাঁহার অধিকাংশ কাব্যে এই দুটি ধারা, পূর্বোক্ত কবিতা দুটির মতো বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র ভাবে নয়, মিলিয়া মিশিয়া, ঐকতানে ধ্বনিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কবি-কাহিনীতে এই দুই ধারার মিশ্রণ। এই কাব্যের মৌলিক বেদনা কবির অতৃপ্তিতে, কিন্তু অন্তিম বেদনা ব্যক্তিগত ক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইয়া মানবসমাজের দুঃখে আর্তনাদশীল। এমন যে হয় তাহার কারণ রবীন্দ্রনাথ ও

[১] 'অ্যালাস্টর' ও কবি-কাহিনী যেমন তুলনীয় কাব্য, তেমনি 'এপিসাইকিডিয়ন' ও মানসসুন্দরী তুলনীয় কাব্য। এই দুই কাব্যের বিস্তারিত তুলনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শেলির মত কবিদের একমাত্র মানদণ্ড ব্যক্তিগত জীবন। ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখের মানদণ্ডের দ্বারাই মানব-সাধারণের সুখদুঃখ পরিমাপ করিতে তাঁহারা অভ্যস্ত। কিম্বা কবি-ব্যক্তি ও মানব-সাধারণ তাঁহাদের ক্ষেত্রে যেন দুই কোঠায় বিভক্ত নয়, সমগ্র জগৎটাই তাঁহাদের কাছে 'সবজেক্‌টিভ', আত্ম-অস্তিত্ব হইতে স্বতন্ত্র বস্তু-জগৎ যেন তাঁহাদের কাছে নাই ; তাঁহারা নিজের দুঃখের কাঁটার উপরে যখন এক পদক্ষেপ করেন তখন অন্য পদক্ষেপ বৃহত্তর দুঃখের উপরে গিয়া পড়ে— সেই জন্য এক তারে যখন আঘাত করেন অন্য তার আপনি রণিত হইয়া ওঠে।

কবি-কাহিনীর প্রথম তিন সর্গে কবি-ব্যক্তির ক্রন্দন— চতুর্থ সর্গে এই ব্যক্তিগত ক্রন্দনের সঙ্গে মানুষের ক্রন্দন মিলিত হইয়া সংগীতকে উদাত্ততর করিয়া তুলিয়াছে।

অবশ্য, পরবর্তী রবীন্দ্রনাথে এই রীতির পরিণতি ঘটিয়াছে। আত্ম-অস্তিত্বের আদিম সমুদ্রের দ্বারা আচ্ছন্ন পৃথিবীতে পর-অস্তিত্বের দ্বীপমালা ধীরে ধীরে জাগিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু যখন তিনি "এবার ফিরাও মোরে" লিখিতেছিলেন— এই সময় শেলির আয়ুঃসীমার বেশি পরবর্ত্তী নয়— তখনও পুরাতন রীতি দূরীভূত হয় নাই, কেবল পদক্ষেপ বিপরীতমুখী হইয়াছে মাত্র। এই কবিতার প্রথম পদক্ষেপ মানুষের দুঃখের উপরে, দ্বিতীয় পদক্ষেপ গিয়া পড়িয়াছে নিজের জীবনের মহৎ অতৃপ্তির উপরে, তৃতীয় পদক্ষেপ মহৎ অতৃপ্তির পরমা শান্তির আশায়, চতুর্থ পদক্ষেপ ব্যক্তিগত ও মানব-সাধারণের জড়িত দয়ালোকের ক্ষেত্রে, সেখানে আত্ম ও বহিঃ ভিন্ন নয়— একের শান্তিতেই যেন দুইয়ের সমস্যার সমাধান।

৪

কবি-কাহিনী কাব্যে প্রকৃতি-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণার বিবর্তনে তিনটি ধাপ দেখা যায়।

প্রথম ধাপে নলিনীকে পাইবার পূর্বে মানব-নিরপেক্ষ প্রকৃতি। কবির বিশ্বাস ছিল এই প্রকৃতি তাহাকে তৃপ্তি দিতে সক্ষম। কিন্তু অত্যল্পকালের মধ্যেই কবি বুঝিতে পারিল ইহাতে তৃপ্তি নাই, কারণ,

মানুষের মন চায় মানুষেরি মন।

দ্বিতীয় ধাপে নলিনীকে পাইয়া কবি ভাবিল, এতদিনে বুঝি সব পাওয়া হইল, বুঝি তৃপ্তি মিলিল। আগেই বলিয়াছি নলিনী ব্যক্তিমাত্র নয়, মানুষের প্রতীক। কিন্তু আবার অত্যল্পকালের মধ্যেই কবি বুঝিতে পারিল, কেবল মানুষের প্রেমে হৃদয়ের মহৎ অতৃপ্তি মেটে না।

কবির সমুদ্র-বুক পুরাতে পারিবে কিসে
প্রেম দিয়া ক্ষুদ্র ওই বনের বালিকা।

তৃতীয় ধাপে দেখি, নলিনীর মৃত্যুর পরে প্রকৃতির এক মহত্তর মূর্তি প্রকাশিত। নলিনীর বা মানুষের অস্তিত্ব প্রকৃতির সহিত মিশিয়া তাহাকে নূতন মহিমা, গভীরতর অর্থ দিযাছে, প্রকৃতির ক্ষেত্র যেন বিশালতর হইয়া গিয়াছে। এ প্রকৃতি প্রথম ধাপের মানব-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ প্রকৃতি আর নয়। প্রকৃতির এই নূতন মূর্তি কবিকে যেন কতকটা সান্ত্বনা দিতে সমর্থ হইয়াছে; কিন্তু শান্তি দিতে পারে নাই এই জন্য যে, মানব-সমাজের দুঃখে সে উতলা হইয়া উঠিয়াছে, নূতন করিয়া বৃহত্তর দুঃখের অভিজ্ঞতা তাহাকে বৃহত্তর অশান্তির ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছে।

ইহা ছাড়া এই বিবর্তনের পথে চতুর্থ একটি ধাপ আছে—যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে ভগবৎ-সত্তা মিশ্রিত। ইহা কবি-কাহিনীর নয়, বিশেষভাবে ইহা গীতাঞ্জলি-পর্বের সম্পদ্।

কিন্তু আমাদের বর্ণিত তৃতীয় ধাপটিই রবীন্দ্র-কাব্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এবং রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণার বিবর্তনে চরমতম ধাপ। উত্তর-বলাকা পর্বের গানের যে অংশগুলি তুলিয়া দিয়াছি তাহা এই চরম বিবর্তনের ইতিহাস বহন করিতেছে।

এই তৃতীয় ধাপের কথা মনে রাখিলে বুঝিতে পারা যাইবে এই কাব্যের চতুর্থ সর্গের প্রকৃত নায়ক হিমালয়, কবি এখানে প্রতিনায়ক। বৃদ্ধ কবি ও বৃদ্ধ হিমালয়, দুজনেই জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রবীণ, দুজনেই মানুষের দুঃখে দুঃখী, দুজনেই মানুষের ইতিহাসের অমানুষিকতার সাক্ষী এবং দুজনেই মানুষের অবশ্যম্ভাবী সত্যযুগের অপেক্ষায় চিরজাগ্রত এবং প্রতীক্ষাশীল। চতুর্থ সর্গের হিমালয় নিছক প্রকৃতি নয়, সে প্রকৃতি ও মানুষের সমন্বয়; সে প্রকৃতির চেয়ে সজীবতর, সে মানুষের চেয়ে সজাগতর; সে কবির দোসর। প্রথম সর্গে এমনটি কখনোই ঘটিতে পারিত না। কবি যেন অবচেতনভাবে বিশ্বাস করেন প্রকৃতির হাতেই সকল দুঃখের—কবির ব্যক্তিগত দুঃখের এবং মানুষের সমষ্টিগত দুঃখের—বিশল্যকরণী রহিয়াছে।[১]

[১] কবি-কাহিনীর হিমালয় ও শেলির Mont Blanc তুলনীয়

ভগ্নহৃদয়

ভগ্নহৃদয় কবির আঠারো-উনিশ বৎসর বয়সের রচনা। কবি ইহাকে গীতিকাব্য বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা নাট্যকাব্য। নাটকের লক্ষণ ইহাতে কিছু আছে, কিন্তু কাব্যের লক্ষণও আছে। পাছে লোকে ইহাকে নাটক বলিয়া গ্রহণ করে সেইজন্য কবিকে ভূমিকায় লিখিতে হইয়াছে—

এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, দৃষ্টান্তস্বরূপেই ফুলের উল্লেখ করা হইল।

ইহার পূর্ববর্তী রচনা দুইটি কাহিনী-কাব্য; ভগ্নহৃদয় রবীন্দ্রনাথের কাহিনী-কাব্য লিখিবার শেষ চেষ্টা; ইতিমধ্যে তিনি যেন বুঝিতে পারিতেছিলেন কাহিনী-কাব্য লিখিবার প্রতিভা তাঁহার নয়, সেইজন্য ভগ্নহৃদয়ে কাহিনী-কাব্যের সঙ্গে নাটকের মিশাল দিয়াছেন। অতঃপর তিনি নাটকের দিকে মনোযোগ দিয়াছেন— বাল্মীকি-প্রতিভা, রুদ্রচণ্ড, কাল-মৃগয়া, নলিনী। বাল্মীকি-প্রতিভা ছাড়িয়া দিলে অন্য সবগুলি ট্রাজেডি। রবীন্দ্র-নাট্যে ট্রাজেডির চরম রাজা ও রানী এবং বিসর্জন। ট্রাজেডি রচনা তিনি শেষ পর্যন্ত ছাড়েন নাই— পরিত্রাণের অনুকল্প মুক্তধারা ট্রাজেডি; রাজা ও রানীর বিকল্প তপতী ট্রাজেডি; রক্তকরবী, নটীর পূজা ট্রাজেডি। কিন্তু রবীন্দ্র-নাট্যপ্রতিভার চরম প্রকাশ ট্রাজেডিতে নহে, অন্যত্র—

তত্ত্বনাট্যে, ঋতুনাট্যে, নৃত্যনাট্যে ; সামান্য লক্ষণের বিচারে এগুলিকে গীতিনাট্য বলা যাইতে পারে।

বনফুলের রচনাকাল ১২৮২-৮৩ ; প্রায় এই সময় হইতেই তিনি গীতিকবিতা লিখিতেছিলেন ; শৈশবসংগীতের অধিকাংশ কবিতার রচনাকাল ১২৮৪-৮৭ ।

তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে গোড়া হইতেই রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার তিনটি বাহন লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন ; কাহিনী-কাব্য, নাটক ও গীতিকবিতা। বনফুল ও কবি-কাহিনীর পরে কাহিনী-কাব্য রচনা ছাড়িয়া দেন ; বাকি থাকিল নাটক ও গীতিকবিতা। বাল্মীকি-প্রতিভা ছাড়িয়া দিলে দেখা যায়, রুদ্রচণ্ড নামক ট্রাজেডি দিয়া তিনি নাট্য রচনা আরম্ভ করেন , প্রচলিত ট্রাজেডি রচনা হইতে শুরু করিয়া নানাবিধ রীতির পরীক্ষার মধ্যে দিয়া পরিণত বয়সে তিনি স্বকীয় নাট্যরীতিতে পৌঁছিয়াছেন।

গীতিকবিতার পরীক্ষা তাঁহাকে দীর্ঘকাল করিতে হয় নাই ; শৈশবসংগীত রচনার পরেই সন্ধ্যাসংগীতের অধিকাংশ কবিতা রচিত। শৈশবসংগীত রচনার পরেও হয়তো কবির মনে সন্দেহ ছিল, কিন্তু সন্ধ্যাসংগীত রচনার পরে আর তাঁহার সন্দেহ ছিল না যে, গীতিকবিতাই তাঁহার প্রতিভার যোগ্য এবং সত্য বাহন। সেইজন্যই সন্ধ্যাসংগীতের মূল্য এত অধিক। আর স্বয়ং কবিও যে মনে করিতেন সন্ধ্যাসংগীত হইতেই তাঁহার কাব্য লোকসমাজে প্রচারযোগ্য, তাহার কারণও কি ইহা নয় ? সন্ধ্যাসংগীতের পর হইতে ক্রমশ গীতিকবিতাই কবির শ্রেষ্ঠ বাহন হইয়া উঠিয়াছে ; সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গীতিকবিতা বাদ দিলে নাটক রবীন্দ্র-প্রতিভার দ্বিতীয়

শ্রেষ্ঠ বাহন। রবীন্দ্র-মনের শ্রেষ্ঠ অংশের পরিচয় তাঁহার গীতিকবিতায়; তার পরেই তাঁহার অপর যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাইবে নাটকে।

নাটক ও গীতিকবিতার সীমান্তপ্রদেশের রচনা ভগ্নহৃদয়; তাহার খানিকটা নাটকীয়, খানিকটা কাব্যীয়; বহির্লক্ষণ নাটকের, অন্তর্লক্ষণ কাব্যের; বেশ বোঝা যায়, দুই শ্রেণীর রচনাই কবির মনকে টানিতেছে; আবার কবিকাহিনী-বনফুল-রচয়িতার কলমও একেবারে বিরতি লাভ করে নাই, সে-ও মাঝে মাঝে দেখা দিয়া গিয়াছে। কাহিনী-কাব্য, নাটক ও গীতিকাব্যের মিশ্রপ্রভাবে ভগ্নহৃদয় সৃষ্টি। ইহা রবীন্দ্র-কাব্যের তেমাথার মোড়; এখানে আসিয়া কবিকে স্থির করিতে হইয়াছে কোন্ পথ তিনি অবলম্বন করিবেন। এই জন্যই এই কাব্যের মূল্য এত অধিক। রবীন্দ্রনাথও এইজন্যই কি জীবনস্মৃতিতে ইহার দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন।

২

ভগ্নহৃদয়ের আলোচনায় প্রবেশ করিবার পূর্বে, যে দুটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব—কাহিনী-কাব্য ও ট্রাজেডি কেন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার যথার্থ বাহন নয়, তিনি তো ঐ দুই-জাতীয় রচনা দিয়াই সাহিত্য-জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কাহিনী-কাব্যের প্রধান প্রেরণা গল্প বলিবার ইচ্ছা। মজবুত রকমের একটা কাহিনী না থাকিলে কাহিনী-কাব্য দাঁড়াইতে পারে না। সেরূপ গল্প তৈয়ারি করিতে হইলে এমন সব পাত্রপাত্রী সৃষ্টি করিতে হইবে যাহারা কেবল কবির

ব্যক্তিত্বের প্রতিবিম্বমাত্র নয়— কবির ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে এমন চরিত্রের উপরেই গল্প দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এইখানেই সমস্যা। একজাতীয় প্রতিভা আছে যাহার পক্ষে এই ক্ষমতা সুলভ; আর-একজাতীয় প্রতিভার পক্ষে ইহার চেয়ে কঠিনতর কাজ আর নাই। এই শেষজাতীয় প্রতিভাকে বলা যাইতে পারে আত্মকেন্দ্রী প্রতিভা; লিরিক ইহার যথার্থ বাহন; ছোট গল্পকেও ইহা নিজের অনুকূলে ব্যবহার করিতে সক্ষম। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা প্রধানতঃ এই শ্রেণীর। আত্মকেন্দ্রী বলিয়া তিনি নিজেকে ডিঙাইয়া গিয়া নরনারী সৃষ্টি তেমন করিতে চাহেন না; যখন করেন তখনও তাহারা ভাষান্তরে ভাবান্তরে কার্যান্তরে কবির ধ্বজাই বহন করে। আত্মনিরপেক্ষ পাত্রপাত্রী সৃষ্টি করিতে না পারিলে, তাহাদের সুখদুঃখময় জীবনকে তাহাদের দৃষ্টিতে দেখিতে না পারিলে গল্প জমিয়া উঠিবে কেমন করিয়া? সেইজন্য বন-ফুল কবি-কাহিনীতে গল্প জমিয়া ওঠে নাই। গল্পের অর্থাৎ ঘটনার অভাব কবি লিরিক উচ্ছ্বাস দিয়া পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, কাব্যদুটিতে গল্পের ক্ষীণ সূত্রে লিরিকের মালা গাঁথা হইয়াছে, গল্প গৌণ হইয়া পড়িয়া লিরিক মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। পরবর্তীকালে এই লিরিক প্রেরণাই গল্পের কাঠামো-মুক্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার রূপ ধারণ করিয়াছে। বন-ফুল ও কবি-কাহিনী পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় কবির হাত লিরিক রচনার, কাহিনী-কাব্য রচনার নয়। বোধ করি ইহা রোমান্টিক মনোবৃত্তিরই ত্রুটি। এই জন্যই শেলি ওয়ার্ডসওআর্থ কোলরিজ কেহই কাহিনী-কাব্য

রচনায় সাফল্য লাভ করেন নাই ; কীট্‌সের সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া 'না' বলা যায় না, কারণ ইহাদের চেয়ে তাঁহার প্রতিভা অনেক বেশি বাস্তবঘেঁষা ছিল।

রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি ট্রাজেডি লিখিয়াছেন কিন্তু ট্রাজেডিতে তাঁহার নাটকীয় প্রতিভার চরম প্রকাশ হয় নাই কেন? জগতে দুটি সংসার আছে—প্রকৃতির সংসার ও মানুষের সংসার ; প্রকৃতির সংসারের ক্ষেত্র বৃহত্তর, মানুষের সংসারের ক্ষেত্র ক্ষুদ্রতর ; প্রকৃতির সংসার নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়, মানুষের সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় না হইলেও ট্রাজেডি-কারের চোখে দুঃখের অংশটাই বেশি ; প্রকৃতির সংসারের দ্বন্দ্বে মানুষের সংসার যেন সুখের পটভূমিতে দুঃখের লীলা, যেন সদানন্দময় মহেশ্বরের বুকের উপর দুঃখের করালী মূর্তির সর্বধ্বংসী নৃত্য।

কোনো লোকের চোখে বেশি করিয়া পড়ে প্রকৃতির আনন্দময় রূপ, আবার কারো চোখে বেশি করিয়া পড়ে মানুষের দুঃখটা ; ইহা অনুপাতের তারতম্যের কথা মাত্র। ওয়ার্ডসওআর্থ ও রবীন্দ্রনাথ বেশি করিয়া প্রকৃতির জগৎটাকেই দেখিয়াছেন—প্রকৃতির জগতের ঘনপিনদ্ধ জ্যোতির্ময় আনন্দের আবরণ। এই আনন্দের দ্বন্দ্বেই মানুষের জীবন তাঁহাদের কাছে প্রতিভাত হয়। এই আনন্দের দ্বন্দ্বেই মানুষের জীবনের দুঃখকে দেখিয়া ওয়ার্ডসওআর্থ বলেন—What man has made of man। প্রকৃতির এই আনন্দের আভা মানুষের জীবনের উপর প্রতিফলিত হইয়া রবীন্দ্রনাথের চোখে তাহাকে আনন্দময় জ্যোতির্ময় করিয়া তুলিয়াছে। দুঃখ তাঁহার কাছে সত্য নয়, কারণ তাহা বিশ্ববিধানের বিরোধী, তাহা অবান্তর, তাহা প্রক্ষেপ। বিশ্বের ঐকতানে প্রকৃতি আপন তানপুরায়

আনন্দের মূল সুরটি যেন ধরিয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ঐ আনন্দের সুরের সঙ্গে নিজের জীবনের সুরটি মিলাইয়া লওয়া। সুর মিলিয়া গেলে আর দুঃখ কোথায়? আর, মিলিতেছে না বলিয়াই যে তাহাকে সত্য মনে করিয়া শিল্পের মর্যাদা দিতে হইবে, ইহাও তিনি বিশ্বাস করেন না। এরকম ক্ষেত্রে ট্রাজেডির ভিত্তিই যে তাঁহার পায়েয় তলা হইতে খসিয়া গিয়াছে। কোথায় তিনি জীবনের ট্রাজিক স্বরূপকে দাঁড় করাইবেন? ইহা তিনি বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়াছেন, সেই সঙ্গে তাঁহার নাট্যজগৎকে ট্রাজেডির ভিত্তি হইতে সরাইয়া আনিয়া অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

আবার যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ট্রাজিক নাট্যকার তাঁহারাও জীবনের আনন্দকে গৌণতঃ স্বীকার করিয়াছেন— কারণ কোনো শ্রেষ্ঠ কবির জগৎ কেবল দুঃখের উপাদানে গঠিত হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি বেশি করিয়া জীবনের দুঃখটার দিকেই— আর আগেই তো বলিয়াছি ইহা কেবল দৃষ্টির অনুপাত-তারতম্যের ব্যাপার। ওথেলোর নিদারুণ প্রতিহিংসাতেই কি প্রমাণ হয় না যে, দাম্পত্যজীবনে আনন্দ আছে। সেই সর্বজনস্বীকৃত আনন্দের অভিজ্ঞতার তুলনাতেই তো ডেসডিমোনার মৃত্যু এমন মর্মান্তিক। আনন্দ না থাকিলে ইহা তো কেবল নিরর্থক নিষ্ঠুরতা মাত্র। স্বৈরপ্রেমে আনন্দ আছে বলিয়াই অ্যান্টনি এবং ক্লিওপেট্রার মৃত্যু যথার্থ ট্রাজিক; স্বৈরপ্রেম আনন্দহীন হইলে কাহার সঙ্গে তুলনায় ইহাদের মৃত্যুকে ট্রাজিক বলিতাম। ট্রাজিক কবিরাও আনন্দের দূত, কেবল তাহারা দুঃখের যুদ্ধের ভগ্নদূত— এইমাত্র প্রভেদ।

ভগ্নহৃদয়ের কবি

শেলির বিপুল প্রতিভা সত্ত্বেও তাঁহার কাব্যজগৎ ব্যাপিয়া যে একটা নিষ্ফলতা সংগতিহীনতা শূন্যতার ভাব আছে তাহার কারণ তিনি এই দুই জগতের কোনোটাকেই একাগ্রদৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই। কিংবা তাঁহার দুই চোখ যেন দুই জগতের দিক সমভাবে নিবদ্ধ ছিল— ফলে চলিবার পথ খুঁজিয়া না পাইয়া, অবস্থাধীনভাবে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া মরিয়াছেন। ওয়ার্ডসওআর্থ-রবীন্দ্রনাথের জগৎ যতই ছায়াশরীরী কুহেলিকাময় লঘুবস্তুরচিত হউক, তাহার একটা ভূগোল আছে, এবং কবিদের হাতে তাহার মানচিত্রও আছে। কিন্তু শেলির দেশের ভূগোল নাই, কিম্বা সত্য কথা বলিতে গেলে, তাঁহার কাব্যজগৎ বলিয়াই কিছু নাই; প্রকৃতির আনন্দময় ও মানুষের দুঃখময় জগতের অন্তর্বর্তী শূন্যলোকে নিরালম্ব নিরাশ্রয়ভাবে নিরন্তর তিনি দোদুল্যমান; শেলি কাব্যজগতের ত্রিশঙ্কু; 'a beautiful and ineffectual angel, beating in the void his luminous wings in vain.'

রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

> স্বাভাবিক হবার শক্তি পরিণত বয়সের, সে বয়সে ভুলচুক থাকতে পারে নানা রকমের, কিন্তু অক্ষম অনুকরণের দ্বারা নিজেকে পরের মুখোসে হাস্যকর করে তোলা তার ধর্ম নয়, অন্তত আমি তাই অনুভব করি।

এই অক্ষম অনুকরণ বিশেষ ভাবের বা কোনো কবিবিশেষের অনুকরণ মাত্র নয়— ইহা এমন একটা শিল্পধারার অনুকরণ যাহা কবির প্রকৃতিজাত নয়। এই শিল্পধারাটি কাহিনী-কাব্য। তৎকালে দীর্ঘ কাব্য, কাহিনী-কাব্য, বা মেঘনাদবধের মতো

এপিক-কাব্য রচনা বাংলা সাহিত্যের প্রথা ছিল। তিনিও দীর্ঘ কাহিনী-কাব্য দিয়াই কবিজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অত্যল্পকালের অভিজ্ঞতাতেই তাঁহার কবিপ্রকৃতি বুঝিতে পারিয়াছিল, ওগুলি তাঁহার পথ নয়— তাঁহার প্রকৃত পথ গীতিকবিতা বা লিরিক।

এবার ভগ্নহৃদয়ের আলোচনায় প্রবেশ করা যাইতে পারে। পূর্ববর্তী দুই কাব্যের তুলনায় ভগ্নহৃদয়ের আয়তন অনেক বৃহত্তর। চৌত্রিশটি ছোট-বড়-মাঝারি সর্গে ইহা সমাপ্ত। ইহাতে কাহিনীর অংশ অত্যন্ত ক্ষীণ। একদিকে কাহিনীর ক্ষীণতা, অন্যদিকে আয়তনের অতিব্যাপ্তি— এই দুই টানে পড়িয়া কাব্যখানি নীহারিকার সূক্ষ্মতা লাভ করিয়াছে; কাহিনীর গতি বুঝিবার জন্য পাঠককে অনেক সময়ে রীতিমতো বেগ পাইতে হয়। এই শিথিলবন্ধ কাব্যে ঘটনার ত্রুটি ভাবনা দিয়া পুরাইয়া লইবার চেষ্টা কবি-কাহিনী ও বন-ফুলের চেয়েও অনেক বেশি। ইহাতে অনেকগুলি সর্গ আছে যাহাতে কোনো ঘটনা নাই; কেবল পাত্রপাত্রীর গানের দ্বারাই সে সর্গগুলি গঠিত। আবার ঘটনাযুক্ত সর্গেও গানের সংখ্যা বিরল নয়; গানগুলি যখন-তখন আসিয়া পড়িয়া ঘটনার ক্ষীণ শোভাযাত্রাকে ধীর মন্থর করিয়া দিয়াছে। গানের দ্বারা ঘটনার স্থান পূরণ করিবার চেষ্টা এবং গানের দ্বারা নাটকের গতিকে মন্থর করিয়া তুলিবার চেষ্টা, এই দুটি অভ্যাসকে ত্রুটি না বলিয়া বলা উচিত, ইহারা পরিণত রবীন্দ্র-নাট্যের দুটি বিশেষ লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের নাটকের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে

গানের সংখ্যা ও গুরুত্ব বাড়িয়াছে ; শেষে এমন হইয়াছে যে গানই পনেরো আনা ; সংলাপের টুকরা দিয়া কেবল একটা গানের সঙ্গে অপরটিকে জোড়া দিয়া রাখা হইয়াছে মাত্র। নাটকের ঘটনাস্রোত যেখানে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে বা হওয়া উচিত, ক্রমে ক্রমে সেখানে গান আসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে ; শেষ পর্যন্ত ঘটনাস্রোত হাল ছাড়িয়া দিয়া গান শেষ হইবার আশায় অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে। রবীন্দ্র-নাটকের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা নিশ্চয় ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। ভগ্নহৃদয়ে এই দুই লক্ষণের প্রথমবারের জন্য প্রকাশ এবং নিঃসংশয় সূচনা।

এবার কাব্যের বস্তু-সংক্ষেপ দিবার চেষ্টা করিব।

অনিল ললিতাকে ভালোবাসে, তাহাদের বিবাহ হইল ; অনিলের বোন মুরলা কবিকে ভালোবাসে। এই কবি পূর্বের কাব্যদ্বয়ের কবির মতোই নামগোত্রহীন। কবি মুরলাকে বাল্যসখী মাত্র মনে করে, তাহার বেশি নয়। কবি যে কাহাকে ভালোবাসে প্রথমে নিজে তাহা বুঝিতে পারে নাই— বোধ করি ভালোবাসিবার সুধা-বিষময় আইডিয়াকেই ভালোবাসিত। অবশেষে সে বুঝিতে পারিল নলিনী বলিয়া একটি মেয়েকে সে ভালোবাসে। নলিনীকে প্রণয়বিলাসিনী বলা যাইতে পারে। অনেকগুলি মুগ্ধ হৃদয়কে সে নিজের চারিদিকে ঘুরাইয়া মারিতেছে ; কাহাকেও ছাড়িবে না, কাহাকেও ভালোবাসিবে না।

এদিকে মুরলা কবির জন্য পাগল ; কবি নলিনীর জন্য পাগল ; তার উপরে আর-এক বিপদ ঘটিল। তীব্র-প্রণয়-উন্মুখ অনিলের পিপাসা লাজময়ী ললিতা মিটাইতে না পারায়

অনিলও নলিনীর প্রণয়ীর দলে যোগ দিল। ওদিকে ব্যর্থ প্রেমে মুরলা ও ললিতা দেশান্তরী হইল। এমন সময়ে নলিনী বুঝিতে পারিল কবি তাহাকে ভালোবাসে। কিন্তু যে বহুবল্লভা সে নিঃসপত্ন হইয়া একের হৃদয়ে ধরা দিতে পারিল না। নলিনীর অন্যান্য প্রণয়াস্পদগণ অপেক্ষা করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া যে যার মতো ঘরে ফিরিয়া বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়া বসিল। কবিও নলিনীর প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়া সরিয়া পড়িল। কবির ভুল ভাঙিল; মুরলার মৃত্যুশয্যায় কবির সঙ্গে তাহার মিলন হইয়া বিবাহ হইল; একই শয্যায় বাসর ও মুরলার চিতা প্রস্তুত হইল। ললিতার শেষ অবস্থায় অনিলের সঙ্গে তাহার মিলন ঘটিল। কিন্তু ললিতা তখন উন্মাদিনী। আর নলিনী প্রেমের লীলার ব্যর্থতা বুঝিতে পারিয়া সত্যকার একটি হৃদয়ের জন্য নিজের অতীতকে ধিক্কার দিতে দিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নলিনী, তাহার প্রণয়ীগণ, ললিতা, মুরলা, কবি, অনিল সকলেই ভগ্নহৃদয়— প্রেমের চোরা পাহাড়ের আঘাতে বানচাল হইয়া সকলেরই হৃদয় ভগ্নহৃদয়।

কবি-কাহিনীর 'কবি' প্রকৃতির রাজ্যের আদিম অধিবাসী। এই কাব্যে 'কবি' মানুষের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; যেন কতকটা অনধিকারপ্রবেশ, কারণ অনধিকারপ্রবেশীর দুঃখ কবির প্রত্যেক পদক্ষেপকে বিড়ম্বিত করিতেছে।

কবি-কাহিনীতে কবি প্রকৃতিতে তৃপ্ত না হইয়া আবার বৃহত্তর প্রকৃতির রাজ্যে প্রবেশ করিল; সেখানেও তৃপ্তি নাই দেখিয়া সে আবার মানুষের কাছে ফিরিয়া আসিল; তখন

মানুষ ও প্রকৃতির সম্মিলিত সত্তা হিমালয়ের মধ্যে যেন দেখিতে পাইয়া জীবনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা উপলব্ধি করিল; যেন জীবনসমস্যার সমাধান লাভ করিল।

ভগ্নহৃদয়ে এমন সুলভ সমাধান নাই। মানুষের হৃদয়ের সব পথঘাট গলিঘুঁজি কবির পরিজ্ঞাত নয়; বারে বারে সে পথ ভুল করিয়াছে; আবার বাধার উপরে বাধা তাহার নিজের হৃদয়ের মহৎ অতৃপ্তি, এবং অপার্থিব ঔদাসীন্য। কবির মধ্যে যেন দুটি সত্তা বাস করিতেছে; তাহার কবিসত্তা, যাহা আর-দশজন হইতে স্বতন্ত্র; আবার তাহার মানবসত্তা, যাহা আর-দশজনের অনুরূপ। এই দুই পরস্পরবিরোধী সত্তার মধ্যে কবি কিছুতেই মিলন ঘটাইতে পারিতেছে না— ইহাই তাহার ট্র্যাজেডি।

এই দুই শক্তির দ্বন্দ্বের ফলে নিজের হৃদয়ের এই আলোড়ন সম্বন্ধে কবি সচেতন। কবি বলিতেছে—

বহুদিন হতে সখি আমার হৃদয়
হয়েছে কেমন যেন অশান্তি-আলয়।
চরাচরব্যাপী এই ব্যোম-পারাবার
সহসা হারায় যদি আলোক তাহার,
আলোকের পিপাসায় আকুল হইয়া
কি দারুণ বিশৃঙ্খল হয় তার হিয়া!
তেমনি বিপ্লব ঘোর হৃদয় ভিতরে
হতেছে দিবসনিশা জানি না কি তরে!

নিজের মহৎ-অতৃপ্তি সম্বন্ধে—

নবজাত উল্কানেত্র মহাপক্ষ গরুড় যেমন
বসিতে না পায় ঠাঁই চরাচর করিয়া ভ্রমণ,

উচ্চতম মহীরুহ পদভরে ভূমিতলে লুটে,
ভূধরের শিলাময় ভিত্তিমূল বিদারিয়া উঠে,
অবশেষে শূন্যে শূন্যে দিবারাত্রি ভ্রমিয়া বেড়ায়,
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ঢাকি ঘোর পাথার ছায়ায় ;
তেমনি এ ক্লান্ত হৃদি বিশ্রামের নাহি পায় ঠাঁই,
সমস্ত ধরায় তার বসিবার স্থান যেন নাই ;

কবি বিশ্রামের স্থান চায়, মানব-হৃদয়ের মধ্যে বিশ্রামের স্থান। তাহার মানবসত্তা তাহাকে ইঙ্গিত করিতেছে মুরলার দিকে, মুরলার একনিষ্ঠ প্রেমে শান্তি আছে, আশ্রয় আছে ; কিন্তু তাহার কবিসত্তা তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছে নলিনীর দিকে। নলিনীর প্রেম তাহার বড় মধুর লাগিয়াছে, কারণ তাহা মোহময় মায়াময়। প্রেমের দুটি রূপ আছে ; একটি মোহময় ও তৃষ্ণাময়, তাহা আকর্ষণ করে ধরা দেয় না ; বাসনাকে জাগাইয়া দেয় কিন্তু বাসনার শান্তি আনয়ন করে না ; তাহা প্রোজ্জ্বল উল্কার মতো মুহূর্তের সমারোহে দীপ্ত হইয়া উঠিয়া কোন্ নামহীন ভস্মস্তূপের মধ্যে আপনাকে নিঃশেষ করিয়া দেয়। আর একটি রূপ, যাহাতে মোহ নাই, মাধুর্য আছে ; যাহা বাসনাকে জাগাইয়া দিয়া সফল শান্তির মধ্যে লইয়া যায় ; তাহা প্রজ্বলন্ত উল্কা নয়— পৃথিবীর স্নেহময় চিরদিনের নীড়। একটি নলিনীর প্রেম, একটি মুরলার প্রেম। ‘কবি’র মধ্যে কবিসত্তা প্রবলতর বলিয়া তাহাকে নলিনীর প্রেমে আকর্ষণ করিয়াছে। কবি ভাবিয়াছে তাহার মহৎ অতৃপ্তির যোগ্য লীলাক্ষেত্র নলিনীর প্রেমের বাধাহীন বৃহৎ আকাশ। কিন্তু মানুষ তো কেবল উড়িতেই চায় না, বসিতেও চায়। কবি নলিনীর প্রেমের বৃহৎ আকাশে

বিহার করিতে বাহির হইয়া বুঝিতে পারিল, এখানে বসিবার স্থান নাই, অনেকের সঙ্গে তাহাকে উড়িতে হইবে; বসিবার আশ্রয় অন্যত্র। এটুকু বুঝিতে তাহাকে অনেক দুঃখ সহ্য করিতে হইয়াছে, অনেক দুঃখ দিতে হইয়াছে, মুরলার মৃত্যুর কারণ হইতে হইয়াছে।

সত্য কথা বলিতে কি, কবির নলিনীর প্রতি ভালোবাসা বস্তুতঃ নিজেকেই ভালোবাসা এবং সেই হিসাবে তাহা প্রেম নহে, বাসনা; প্রেম পরমুখী, বাসনা আত্মমুখী। নিজের হৃদয়ের অশান্তি অতৃপ্তি, বাসনার দীপ্তি এবং বর্ণচ্ছটা কবি নলিনীর মধ্যে দেখিতে পাইয়াছে; নলিনী তাহার অন্তরের বাহ্য প্রতীক; নলিনী তাহার বাসনার মরুভূমির মরীচিকা; তাহার হৃদয়-অরণ্যের স্বর্ণমৃগী; নলিনী তাহার কবিসত্তার বিকল্প; নলিনীই তাহার কবিসত্তা। সেইজন্য স্বভাবতই কবি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং সেইজন্য স্বভাবতই তাহাতে তৃপ্তি পায় নাই; কারণ প্রেম আত্মমুখী নয়, পরমুখী। অনিল ইহা জানে, তাই মুরলাকে বলিতেছে—

> যে জন রেখেছে মন শূন্যের উপরে,
> আপনারি ভাব নিয়া উলটিয়া পালটিয়া
> দিন রাত যেই জন শূন্যে খেলা করে, ..
> আঁখি যার অনিমিখ আকাশের প্রায়,
> মাটিতে চরণ তবু মাটিতে না চায়,...
> স্বার্থপর, আপনারি ভাবভোরে ভোর,
> আজিও সে দেখিল না হৃদয়টি তোর ? ..
> আপনারে ছাড়া কেহ নাহি দেখিবার ?

ইহাই কবির যথার্থ চরিত্রচিত্র। সে আপনাকে ছাড়া

আর কাহাকেও দেখিতে পায় না। তবে যে নলিনীকে দেখা, সে তাহার নিজেকে দেখা ছাড়া আর কিছু নয়— কারণ, নলিনীই তাহার কবিসত্তার বিকার।

মানবহৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে পড়িয়া কবি নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছে; তখনই সে কবিসত্তার দাবি অগ্রাহ্য করিয়া মানবসত্তার দাবি পূরণ করিয়াছে। কবির মানবহৃদয় মুরলার মানবহৃদয়ের মৃত্যুশয্যার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, বড় দুঃখের সে মিলন, কিন্তু সুখময় মোহের চেয়ে দুঃখময় মিলন শতগুণে শ্রেয়। এই কাব্যের ইহাও অন্যতম অভিজ্ঞতা।

মহাকবিদের অল্পবয়সের রচনা অপরিণত হইতে পারে, ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ হইতে পারে, শিল্পের বিচারে অবজ্ঞ হইতে পারে, কিন্তু তবু তাহা মহাকাব্যের অঙ্কুর ছাড়া আর কিছু নয়। ভগ্নহৃদয়ের অপরিণতির মধ্যে পরিণত রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। মানবহৃদয় ও প্রেমের সম্পর্কের যে আভাস এই কাব্যে তাহার পরিণততম ফল পূরবীতে, মহুয়ায় ও পরবর্তী সব কাব্যে। আর-একটি বিষয়েও এই অপরিণতির মধ্যে পরিণতির আভাস দেখাইতে চেষ্টা করিব।

এই কাব্যের ললিতা, মুরলা ও নলিনীকে প্রকৃতি-অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা চলে। ললিতা, মুরলা এক জাতের মেয়ে; নলিনী অন্য জাতের। এই দুই শ্রেণীর মেয়েই শিল্পী রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে বরাবর আকর্ষণ করিয়াছে। ভগ্নহৃদয়ে ইহাদের প্রথম আভাস। পরিণত বয়সে এই দুই শ্রেণীর তত্ত্বরূপ গদ্যে ও পদ্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।
একজনা উর্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনারাজ্যে রানী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।

মানব-মনের উপর ইহাদের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে ঐ কবিতাতেই বলিতেছেন—

একজন তপোভঙ্গ করি
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি
নিয়ে যায় প্রাণ মন হরি,
দুহাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।
আর-জন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশিরস্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়,
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায়;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদ-পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্যসুধায় মধুর।
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবন-মৃত্যুর

পবিত্র সংগমতীর্থতীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে। —বলাকা

এই আইডিয়া সম্বন্ধেই আরও পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি। এক জাত প্রধানত মা, আর-এক জাত প্রিয়া। ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষা ঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, উর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।

আর প্রিয়া বসন্ত ঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায় যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায়, যে-ঝংকারে বেজে বেজে ওঠে সর্ব দেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী। —দুই বোন

আরও উদাহরণের প্রয়োজন হইলে বলিতে পারা যায়, কণ্বের তপোবনের শকুন্তলা প্রিয়া, আর মারীচের তপোবনের শকুন্তলা মাতা। কালিদাস একজনেরই জীবনে দুইয়ের বিকাশ দেখাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থে করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্র-নাথের মনে নারীর এই দ্বৈতভাব-স্ফুটনে কালিদাস কতকটা সাহায্য করিয়াছেন। নারীর এই দ্বৈতভাবকে 'জায়াজননীবাদ' বলা যাইতে পারে।

ললিতা ও মুরলা স্বভাব-জননী; নলিনী স্বভাব-প্রিয়া। নলিনী যে কখনো সংসারী হইবে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন, আবার ললিতা মুরলা বিবাহের আগে হইতেই একটি সাংসারিক

পরিমণ্ডল নিজেদের চারিদিকে যেন বহন করিতেছে। নলিনী তাহার প্রণয়ীদের "উচ্চহাস্যে-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি নিয়ে যায় প্রাণ মন হরি", আর ললিতা ও মুরলা প্রণয়ী-চিত্তকে "ফিরাইয়া আনে অশ্রুর শিশিরস্নানে স্নিগ্ধ বাসনায়, হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায় ফিরাইয়া আনে নিখিলের আশীর্বাদ-পানে।" ললিতায় ও মুরলার মধ্যে প্রবল হৃদয়াবেগ আছে কিন্তু সংসারের মঙ্গল-বিধানের প্রতি স্বভাবতই তাহাদের দৃষ্টি আছে বলিয়া তাহা একান্ত হইয়া উঠে নাই। আর নলিনীর সে বাধা না থাকাতে প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ একান্ত হইয়া উঠিয়া এমন দাবানলের সৃষ্টি করিয়াছে যাহাতে তাহার পুড়িয়া মরা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

হৃদয়াবেগ সাহিত্যের একটা উপকরণ মাত্র, তাহা যে লক্ষ্য নহে, সাহিত্যের লক্ষ্যই পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য, সুতরাং সংযম ও সরলতা, এ কথাটা এখনো ইংরেজি সাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয় নাই। —জীবনস্মৃতি, "ভগ্নহৃদয়"

এই পরিপূর্ণতার সৌন্দর্যই রবীন্দ্র-সাহিত্যের লক্ষ্য— এই লক্ষ্যের দিকেই ক্রমবর্ধমান গতিতে রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রাগ্রসর। সেইজন্যই জীবনস্মৃতির ভগ্নহৃদয়-প্রসঙ্গে হৃদয়াবেগের বহ্ন্যুৎসবকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেন নাই; কি ইংরেজি সাহিত্যে, কি অনুকরণধর্মী বাংলা সাহিত্যে, হৃদয়াবেগের এই অতিশয়তাকে তিনি নিন্দাই করিয়াছেন। কিন্তু জীবনস্মৃতি তো তিনি লিখিয়াছেন পঞ্চাশের কাছে; তৎপূর্বের অনেক রচনায় এই বহ্ন্যুৎসবের কিছু কিছু পরিচয় আছে, জীবনস্মৃতির পরবর্তী যুগের রচনাতেও বহ্ন্যুৎসবের দীপ্তি একেবারে নাই এমন বলিতে পারি না। কিন্তু কোথাও তিনি হৃদয়াবেগের

আগুনে লঙ্কাকাণ্ড ঘটিতে দেন নাই। হৃদয়াবেগের লীলা তিনি দেখাইয়াছেন, কারণ মানুষের স্বভাবের মধ্যেই ইহা আছে; আবার হৃদয়াবেগের নিবৃত্তিও দেখাইয়াছেন কারণ মানুষের মহত্তর স্বভাবের মধ্যেই ইহারও স্থান। "হৃদয়াবেগ সাহিত্যের উপকরণমাত্র"; উপকরণকে তিনি লক্ষ্য করিয়া তোলেন নাই।

হৃদয়াবেগের এই প্রচণ্ডতা বউঠাকুরানীর হাটের রুক্মিণীতে আছে। অল্পবয়সের এই রচনাতে হৃদয়াবেগকে সংযত করিবার কোনো চেষ্টা কবির ছিল না— ফলে হৃদয়াবেগের দাবদাহে হতভাগিনী পুড়িয়া মরিয়াছে। রাজা ও রানীর বিক্রমদেব-চরিত্রে হৃদয়াবেগের প্রচণ্ডতা অতিশয় হইয়া উঠিয়া বিরাট ট্রাজেডির সৃষ্টি করিয়াছে। চোখের বালির বিনোদিনী প্রবল হৃদয়াবেগ-বিশিষ্ট জীব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাকে অতিশয় হইয়া উঠিতে দেওয়া হয় নাই; অনেকে মনে করেন, বিনোদিনীকে তাহার পথে শেষ পর্যন্ত যাইবার স্বাধীনতা দিলে উপন্যাসের শিল্পমর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিত। ঘরে-বাইরের সন্দীপ অগ্নিধর্মী ব্যক্তি— কিন্তু এই উপন্যাসের পরিণাম নিখিলেশের আয়ত্ত; হৃদয়াবেগের বহ্নিতে ঘরে-বাইরে আগুন লাগাইয়া বেড়ানোকে সে ধিক্কৃত করে। দুই বোনের শর্মিলা মায়ের জাত, উর্মিমালা প্রিয়ার; কিন্তু ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের শিল্পধর্ম এমন পরিণত হইয়াছে, তাহার লক্ষ্য এমন সুপরিস্ফুট যে, উর্মিমালার আগুন লাগাইবার সাধ্য আর নাই, সে যেন কবির শিল্পধর্মের উদাহরণ-স্বরূপেই গল্পের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; কবির তত্ত্বকে রূপ দেওয়া ছাড়া অধিকতর কার্যকারিতা যেন তাহার আর নাই।

ললিতা-মুরলা স্বভাব-জননী; মানব-স্বভাবের দুর্বলতার জন্য, চপলতার জন্য সংসারে তাহারা সুখ পায় নাই, কিন্তু

মৃত্যুতে সান্ত্বনা পাইয়াছে। নলিনী স্বভাব-প্রিয়া, বহু প্রণয়ের সুখেও সে সুখী হইতে পারিল না, আবার মৃত্যুর সান্ত্বনা হইতেও কবি তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

জীবনস্মৃতির ভগ্নহৃদয়-প্রসঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের অসংযমকে তিনি নিন্দা করিয়াছেন; তাহার অনুকরণে বাংলা সাহিত্য-সৃষ্টিকেও সমর্থন করেন নাই; ভগ্নহৃদয়ে এই হৃদয়াবেগের আতিশয্য অত্যন্ত প্রবল; এ সমস্তই সত্য। কিন্তু সব চেয়ে বেশি সত্য— ভগ্নহৃদয়েই হৃদয়াবেগের আতিশয্যের প্রতিষেধক আছে; নলিনীর দুঃখময় জীবনে এবং ললিতা-মুরলার সান্ত্বনাময় মৃত্যুতে। তবে সমস্তই দুর্বল— সে দুর্বলতা বনস্পতির অঙ্কুরের দুর্বলতা; কবির পরবর্তী জীবনে এই অঙ্কুর ক্রমে পল্লবিত পুষ্পিত হইয়া বনস্পতির বলিষ্ঠ দার্ঢ্য লাভ করিয়াছে। ভগ্নহৃদয় দুর্বল অঙ্কুর বলিয়া অবহেলার নয়; বনস্পতির অঙ্কুর বলিয়া তাহা একান্ত প্রণিধানযোগ্য। এই অঙ্কুরের মধ্যেই পরিণত বনস্পতির ধর্ম এবং অনেকগুলি লক্ষণ নিশ্চিতভাবে নিহিত রহিয়াছে।

শৈশবসংগীত

শৈশবসংগীতের ভূমিকায় কবি লিখিতেছেন—

এই গ্রন্থে আমার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ করিলাম, সুতরাং ইহাকে ঠিক শৈশবসংগীত বলা যায় কিনা সন্দেহ।

অধিকাংশ কবিতার ভারতীতে প্রকাশের সময় ১২৮৪ হইতে ১২৮৭ ; পুস্তক প্রকাশের তারিখ ১২৯১ বা ১৮৮৪। ভানুসিংহের কয়েকটি কবিতা ছাড়িয়া দিলে ইহাই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম লিরিক-সমষ্টি। সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীতের প্রকাশ আগে কিন্তু রচনা শৈশবসংগীতের পরে।

এবার রবীন্দ্রনাথের প্রথম-বয়সের লিরিকের ও নাটকের প্রকাশ-তারিখের তুলনামূলক একটা তালিকা পাশাপাশি স্থাপন করিয়া আমার বক্তব্য আরম্ভ করিব।

সন্ধ্যাসংগীত—১৮৮২	প্রকৃতির প্রতিশোধ—১৮৮৪
প্রভাতসংগীত—১৮৮৩	নলিনী—১৮৮৪
ছবি ও গান—১৮৮৪	রাজা ও রানী—১৮৮৯
কড়ি ও কোমল—১৮৮৬	বিসর্জন—১৮৯০
মানসী—১৮৯০	

এই তালিকা অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে রবীন্দ্রনাথের নাটক ও লিরিক সমান্তরালভাবে চলিয়াছে কিন্তু লিরিকের চেয়ে নাটকের পরিণতি ও পূর্ণতা তাঁহার প্রতিভায় অনেক আগে ঘটিয়াছে। রাজা ও রানী, বিসর্জন এবং মানসী সমকালিক। মানসীতে 'মেঘদূত', 'অহল্যার প্রতি' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্র-লিরিকের পূর্ণ এবং

নিঃসংশয় প্রকাশ ইহাতে ঘটে নাই ; ইহার অধিকাংশ কবিতায় একটা পরীক্ষার ভাব আছে— যে-পরিমাণে ইন্ধন আছে, সে পরিমাণে শিখার দীপ্তি নাই। অথচ এই সময়ের রাজা ও রানী এবং বিসর্জন রবীন্দ্রনাথের ট্রাজেডি রচনার পরীক্ষোত্তীর্ণ ফল। অনেকে বিসর্জনকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডি মনে করেন ; রাজা ও রানীর চেয়ে বিসর্জনের গঠন পিনদ্ধতর, কিন্তু মোটের উপরে, কাব্যাংশে ও নাট্যাংশে রাজা ও রানীকে আমার শ্রেষ্ঠ মনে হয় ; শুধু বিসর্জনের চেয়ে নয়, রবীন্দ্রনাথের ট্রাজেডির মধ্যে নিছক নাট্যরসের বিচারে রাজা ও রানীই শ্রেষ্ঠতম। বিসর্জন রাজা ও রানীর পরে রবীন্দ্রনাথ আর তেমন করিয়া ট্রাজেডি রচনায় মন দেন নাই ; কিম্বা যখন ট্রাজেডি রচনা করিয়াছেন তখন তাহার মধ্যে অন্য রসের, অন্য গুণের প্রাধান্য ঘটাইয়াছেন। কবি-নাট্যকার যেন অবচেতনভাবে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, যে এ পথে, নিছক ট্রাজেডি রচনার পথে, তাঁহার আর অধিকদূর যাইবার সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু তাঁহার লিরিক রচনার বিবর্তন এমন নহে। সোনার তরীতে রবীন্দ্র-লিরিক-প্রতিভার পরীক্ষোত্তীর্ণ নিঃসংশয়িত আবির্ভাব ; এবং তার পর হইতে নূতনতর শক্তিতে, নূতনতর পথে তাহার যাত্রার আর শেষ হয় নাই। তাঁহার লেখনীর শান্তির সঙ্গেই তাঁহার লিরিক-বিবর্তনের অবসান ঘটিয়াছে।

আমার এই বিশ্লেষণ যদি সত্য হয়, তবে সমস্যা দাঁড়ায়, প্রধানতঃ যাঁহার প্রতিভা লিরিকীয়, এবং সে প্রতিভা অলোক-সামান্য, তাঁহার ক্ষেত্রে এমনটি ঘটিল কেন ? শৈশবসংগীতের আলোচনা করিতে গিয়া প্রসঙ্গতঃ ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে আশা করা যায়।

শৈশবসংগীতের অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু কি ? 'ফুল-বালা', 'দিক্‌বালা', 'অপ্সরা-প্রেম', 'কামিনী ফুল', 'গোলাপ-বালা', 'ফুলের ধ্যান', 'প্রভাতী' প্রভৃতি। এসব বিষয় কবিরা তখনই গ্রহণ করিয়া থাকে যখন জীবনের সঙ্গে তাহাদের পূর্ণ পরিচয় ঘটে নাই। জীবন-পরিচয়ের অপূর্ণতা ঢাকিবার ইহা উপায়ান্তর মাত্র। রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সে প্রকৃতি মানুষের বিকল্প হইয়া উঠিয়াছে ; শৈশবসংগীতের প্রকৃতি মানুষের বিকল্প নয়, নিছক প্রকৃতিও নয়, জীবনসমুদ্রে সদ্য-নিক্ষিপ্ত, সাঁতারে অনভ্যস্ত, মজ্জমান কবির খড়কুটা অবলম্বন করিয়া কোনোরূপে ভাসিয়া থাকিবার একটা চেষ্টা মাত্র। এই কাব্য পাঠে বুঝিতে পারা যায় কবির প্রতিভার অগ্নি আছে, অথচ সেই অগ্নি এখনো তাহার ইন্ধন পায় নাই। ইহাতে প্রেমের কবিতা অনেকগুলি আছে, কিন্তু প্রেমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কবির নাই। এসব প্রেমের কবিতার মূলে বাস্তব অভিজ্ঞতা নয়, কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয় ; কবি যেন প্রেমের আইডিয়ার সঙ্গেই প্রেমে পড়িয়াছেন। বোধ করি সকল কবির জীবনেই এমনটি ঘটিয়া থাকে ; প্রেমের আইডিয়ার সঙ্গে প্রেম— ইহাই বুঝি তাহাদের জীবনের প্রেমের প্রথম অভিজ্ঞতা ; ক্রমে তাহা সংকীর্ণতর হইয়া, বাস্তবতর হইয়া ব্যক্তিবিশেষে নিবদ্ধ হয় ; এবং আবার সেই বাস্তব অভিজ্ঞতা ক্রমে ব্যাপকতর হইয়া সার্বজনীন শিল্পমূর্তি লাভ করে। কিন্তু তার জন্য বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার আবশ্যক। অনঙ্গ তো এক সময়ে অঙ্গধারী ছিলেন বটে।

সার্থক শিল্পসৃষ্টির জন্য জীবন-পরিচয় দরকার ; সে পরিচয় ব্যক্তিগত-অভিজ্ঞতা-প্রসূত হইতে পারে, কিম্বা অপরের

অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগাইতে পারে। এই জীবন-পরিচয়ের ঐকান্তিক অভাব শৈশবসংগীতে; পরবর্তী লিরিক-কাব্যে তাহা বাড়তির মুখে; সোনার তরীর পূর্বে এই জীবন-পরিচয় ও শিল্পজ্ঞান সমতা লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মানসীতে যে পরিমাণে জীবন-পরিচয় আছে, সে পরিমাণে শিল্পশক্তি নাই, সেইজন্য এই কাব্যে পরীক্ষার ভাবটা অত্যন্ত প্রকট।

এই সময়ের নাটক যে অনেক বেশি পরিণত তাহার কারণ জীবন-পরিচয়ের জন্য এখানে কবিকে নিজের অভিজ্ঞতার জগতে হাতড়াইয়া বেড়াইতে হয় নাই। নাটকের গল্পাংশেই তিনি তাহা হাতের কাছে পাইয়াছেন। এই গল্পাংশ অর্থাৎ অপরের জীবনের অভিজ্ঞতা— কবির পক্ষে পরোক্ষ অভিজ্ঞতা— অবলম্বন করিয়া তিনি শিল্পসমুদ্রে পাড়ি দিয়াছেন; শৈশব-সংগীতের খড়কুটা দিয়া তাহা করা সম্ভব হয় নাই। রোমান্টিক কবির আত্মনির্ভর ব্যক্তিত্ব যেখানে নিজেকে অসহায় অনুভব করে, অপরের অভিজ্ঞতা সেখানে তাহাকে কতকাংশে সাহায্য করিতে সমর্থ। ভানুসিংহের অনেক কবিতা শৈশবসংগীতের সমকালীন হইলেও যে শৈশবসংগীতের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর, তাহার কারণও ইহাই। এখানেও রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কাহিনীটি কবিকে রচনা করিতে হয় নাই। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের অভিজ্ঞতার একটা বিতান তিনি পাইয়াছিলেন; তাঁহার অপরিণত অভিজ্ঞতার কোমল লতাগুলি সেটিকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়া পুষ্পপল্লব বিকাশ করিয়াছে। শিশু-তরু যতক্ষণ না নিজের শক্তিতে দাঁড়াইতে পারিতেছে, ততক্ষণ তাহার পক্ষে একটা কাঠির দরকার, এই কাঠিই পরের অভিজ্ঞতা;

ভানুসিংহের পদাবলীতে তাহা আছে, বিসর্জন এবং রাজা ও রানীতেও তাহা আছে। ইহারই অভাবে শৈশবসংগীত দুর্বল, এই দুর্বলতা ক্রমঃক্ষীয়মান অবস্থায় মানসী পর্যন্ত চলিয়াছে; সোনার তরীতে বনস্পতি আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

শৈশবসংগীতের প্রধান গুণ জীবন-পরিচয় নহে, কবিতার গীতিসম্পদ্। জীবন-পরিচয়ের সন্ধান করিলে পাঠক এখানে ব্যর্থ হইবেন, কিন্তু তাঁহার ব্যর্থ সন্ধানের সমস্ত শ্রম সার্থক হইবে এই কাব্যের অলৌকিক গীতিসম্পদ্ শুনিতে পাইলে। "সোনার পিঞ্জর ভাঙ্গিয়ে আমার", কিম্বা, "শুন, নলিনী খোল গো আঁখি", কিম্বা, "বলি ও আমার গোলাপ-বালা" প্রভৃতি কবিতার লিরিকত্বের তুলনা কোথায়? পরিণত রবীন্দ্র-কাব্যের বাহিরে এসব লিরিকের তুলনা পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের সমশ্রেণীর সন্ধান করিতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবপদাবলীতে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। কবিতার এই গীতিসম্পদ্ রবীন্দ্রনাথের জন্ম-মুহূর্তের সঙ্গী, এই গুণেই তাঁহার প্রথমবয়সের কাব্যগুলি, নানা দোষত্রুটি সত্ত্বেও, আজ পর্যন্ত পাঠ্য। মাইকেলের কাব্য এবং বিহারীলালের কাব্যের কোনো কোনো অংশ ছাড়া এমন কথা সেকালের কোন্ কবির সম্বন্ধে আর প্রযোজ্য? কবিতার এই লিরিক-শক্তি বা গীতিসম্পদকেই পূর্বে আমরা শৈশবসংগীতের শিখা বলিয়াছি, এবং জীবন-পরিচয়রূপ ইন্ধনের অভাবেই যে সে শিখা অনির্বাণ দীপ্তি লাভ করে নাই তাহারও আভাস দিয়াছি।

শৈশবসংগীতের কাব্যোৎকর্ষ বিচার করিতে বসিলে অবিচার

করা হইবে। এই কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে ভবিষ্যৎ রবীন্দ্র-কাব্যের মহত্ত্বের সূচনা আছে, ইহাই শৈশবসংগীতের বৈশিষ্ট্য। ইহা রবীন্দ্র-কাব্যের পরীক্ষার যুগের রচনা, নানা শ্রেণীর কাব্যের পরীক্ষা ইহাতে আছে। এই পরীক্ষা মানসী পর্যন্ত চলিয়াছে, সে-কথা আগেই বলিয়াছি। শৈশবসংগীতের কয়েকটি পরীক্ষার ধারা পরিণত কাব্যে পরিত্যক্ত হইয়াছে, আবার কতকগুলি কবির শক্তির অনুকূল ক্ষেত্র বিবেচিত হওয়ায় পরবর্তী কাব্যে বিশেষভাবে গৃহীত হইয়াছে। পরিণত রবীন্দ্র-কাব্যের সূচকরূপে কবিতাগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমাদের অভিমত প্রকাশ করিব।

'অতীত ও ভবিষ্যৎ' কবিতায় প্রকৃতির বাস্তব চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা আছে। মানসীর 'আকাঙ্ক্ষা', 'কুহুধ্বনি', 'বধূ' এবং চৈতালির 'মধ্যাহ্ন' কবিতাতেও প্রকৃতির বাস্তব চিত্র দেখি। বাস্তব চিত্র অঙ্কন রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত নহে; প্রকৃতিকে আদর্শায়িত করিয়া আঁকিতেই তিনি যেন ভালোবাসেন।

'প্রতিশোধ' ও 'লীলা' গাথাজাতীয় কবিতা। এই জাতীয় কবিতার পরিণতি কথা ও কাহিনী কাব্যে। শৈশব-সংগীত রবীন্দ্রনাথের শিল্পের Storm and Stress পর্বের রচনা। কাজেই ইহাতে প্রচুর রক্তপাত, মারামারি, খুনা-খুনি আছে, কিন্তু পরিণত শিল্পের শান্তি ও ধৃতি ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়, আশা করাও যায় না।

'অপ্সরা-প্রেম' গাথা হইলেও পূর্বোক্ত গাথা হইতে ভিন্ন। ইহার পরিণতি মানসী কাব্যের 'নারীর উক্তি' 'পুরুষের উক্তি' এবং 'গুপ্ত প্রেম', 'ব্যক্ত প্রেম' কবিতাগুলিতে। এসব

অনেকটা ব্রাউনিঙের নাট্যোক্তিকাব্যশ্রেণীর অনুরূপ। পরিণত রবীন্দ্র-কাব্যে এ ধারা বর্জিত হইয়াছে।

'ভগ্নতরী'ও গাথা; আগেরগুলির চেয়ে দীর্ঘতর; ভগ্নহৃদয়ের চেয়ে অনেক ছোট। এই গাথা-কাব্যটি চরম নাটকীয় মুহূর্তে লইয়া হঠাৎ শেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে ঘটনায় যাহা ঘটিল না, ভাবনায় তাহার প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে; ইহাতে কাব্যরসের হানি না হইয়া বৃদ্ধি হইয়াছে মনে হয়। কবি কি রচনার আগে 'ইনক্ আর্ডেন' পড়িয়াছিলেন?

'ফুলবালা,' 'দিক্‌বালা', 'ফুলের ধ্যান', 'প্রভাতী', গোলাপ-বালা একজাতীয় কবিতা। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন কিশোর রবীন্দ্রনাথের রচনাকে ফুলবালার যুগ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আংশিক সত্য আছে। মানুষের সত্য আবিষ্কারের ক্ষমতা কিশোর কবির পক্ষে সহজ ছিল না—তাই তিনি ফুল লতা পাতা চাঁদকে লইয়া একটা স্বকীয় পৃথিবী গড়িয়া লইয়াছেন। ইহারা না নিছক প্রকৃতি, না মানুষের প্রতীক; ইহারা কবির অপরিণত, ছায়াময় অস্তিত্বের সহচর মাত্র।

'প্রভাতী' ও 'গোলাপ-বালা' পূর্বরাগের সংগীত। ব্যক্তি-বিশেষের প্রেমের পূর্বরাগ নয়; নির্বিশেষ প্রেমের পূর্বরাগ। এই কবিতা দুটি গীতসম্পদে এমন সমৃদ্ধ যে রবীন্দ্রনাথের পরিণত গানের আসরেও ইহারা আপন মর্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ।[১]

---

১ গৃহপ্রবেশ নাটকের অভিনয়-সংস্করণে গোলাপ-বালা গানটি আংশিক ও পরিবর্তিত আকারে কবি কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে।

'লাজময়ী' ভগ্নহৃদয়ের সপ্তম সর্গের প্রথমে সন্নিবিষ্ট আছে।

'হর-হৃদে কালিকা'তে হেমচন্দ্রের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট—বিষয়বস্তুতে এবং ছন্দে।

শৈশব-সংগীত কাব্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা 'পথিক'। এই কবিতাটির ভাব লইয়াই যেন মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের 'যাত্রা' বিভাগের মুখবন্ধ কবিতাটি[১] লিখিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য 'পথিক' কবিতার পরবর্তী-রূপ অনেক সুষ্ঠু ও সাবলীল, কিন্তু বক্তব্য দুটি কবিতাতেই সমান। যেসব লক্ষণের জন্য রবীন্দ্র-কাব্যের সূচনা হিসাবে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের[২] এত প্রতিষ্ঠা তাহার সব লক্ষণই 'পথিক' কবিতাটিতে আছে। ইহা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের আগে লিখিত হইলেও শিল্পসৃষ্টি হিসাবে খুব নিম্নতর পর্যায়ের নহে। কবি রবীন্দ্রনাথ যে কবি-পথিক, শিখরের সুপ্তির মধ্যে যে তিনি সমুদ্রের আহ্বান শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়া সেইদিকে অগ্রসরশীল, দুটি কবিতাতেই কবি-পথিকের সেই সমুদ্র-ব্যাকুলতা, পান্থজীবনের চিরচঞ্চলতা, জনতার মধ্যে থাকিয়াও নির্জনত্ব, বন্ধনকে গ্রহণ করিয়াও তাহা অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়া, রবীন্দ্র-কাব্যের এ সমস্ত তত্ত্বই 'পথিক' কবিতাটিতে আছে। প্রভাতসংগীতের কবিতাটি যদি সত্যই রবীন্দ্র-কাব্যে নির্ঝরের

---

১ কবিতাটি বর্তমানে উৎসর্গ কাব্যের সংযোজন অংশের প্রথমে স্থান পাইয়াছে।

২ "আমি সেই দিনই সমস্ত মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখিলাম। ... একটি অপূর্ব অদ্ভুত হৃদয়-স্ফূর্তির দিনে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে।" —পাণ্ডুলিপি, জীবনস্মৃতির পাদটীকা। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭শ খণ্ড।

স্বপ্নভঙ্গ হয়, তবে শৈশবসংগীতের কবিতাটি নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের স্বপ্ন। এই স্বপ্নভঙ্গের স্বপ্ন পরবর্তী কাব্যে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই হিসাবে এই কবিতাটিকেই "আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা" বলিয়া ধরিতে হইবে।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী প্রণীত

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

মাইকেল মধুসূদন   বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য

কাব্য ও কবিতা

দেয়ালি   বসন্তসেনা   আত্মঘাতিনী

প্রাচীন আসামী হইতে

বিদ্যাসুন্দর

প্রাচীন গীতিকা হইতে

যুক্তবেণী   অকুন্তলা

উপন্যাস ও গল্প

দেশের শত্রু

পদ্মা   জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার

কোপবতী

শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব

শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব

গল্পের মতো   ডাকিনী   গালি ও গল্প

নাটক

ঋণং কৃত্বা   ঘৃতং পিবেৎ

মৌচাকে ঢিল   পরিহাসবিজল্পিতম্

ডিনামাইট   গভর্মেণ্ট ইন্সপেক্টর

সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৫	২৫	আলোর	আলোয়
৮০	২৪	দয়ালোকের	ছায়ালোকের